কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪৩ সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার
জন্য দ্রুত-পঠন (Rapid Reading)-পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
(৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ তারিখের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)

বঙ্গের বীর-সন্তান

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,
এম. এ., বি. টি., সরস্বতী
প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

প্রকাশক :
বৃন্দাবন ধর য়্যাণ্ড্ সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জন্সন্ রোড্, ঢাকা

সপ্তম সংস্করণ
১৩৪৭

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জী
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

উৎসর্গ

বাংলার ভবিষ্যৎ আশার আলোকস্তম্ভ,

অনাগত দিনের জয়ধ্বজাবাহী,

দেশমায়ের বুকের ধন,

বাংলার তরুণদের

করে

তা'দেরই দেশের ও জাতির

বীরগণের

দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও মহত্ত্বমণ্ডিত

এই

জীবন-কাহিনীগুলি

অর্পণ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস নাই বলিয়া বিলাপ করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকেই দোষী বলিব। বাঙ্গলার ইতিহাসের অপর্য্যাপ্ত উপকরণ পড়িয়া আছে, এখন তাহার অনেকাংশ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আর দশ বৎসর পরে হয়ত তাহা থাকিবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ষ্টুয়ার্ট, মার্সম্যানের আদর জানেন, তাঁহারা যে গীত গাহিয়া যান, তাহার দোহার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের দেশ নিজের চোখে দেখিবার ক্ষমতা রাখেন না। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎচন্দ্র রায় তাঁহার মুক্ত হস্তের দান এবং অতুলনীয় ঐতিহাসিক কৌতূহল লইয়া বঙ্গের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কুমারবাহাদুরের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহাদের চেষ্টার ফল স্বরূপ রাজসাহির নিউজিয়ম্, গৌড়ীয় লেখমালা এবং রাজসাহির কোন কোন স্থান খননকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কার্য্য সুপ্রসার,—সমুদ্র তুল্য, দুই-একটি কূপ খননের দ্বারা আর কতটা সফলতার আশা করা যায়? আট-নয় শত বৎসর পূর্ব্বকার অগণ্য মালমসলা চারিদিকে পড়িয়া আছে,—মুষ্টি মুষ্টি করিয়া আনিলে তাহার কতটা উদ্ধার হইবে? সমস্ত জাতির জাগ্রত হইয়া এই বৃহৎ কর্ত্তব্যের দায়িত্বের ভার স্কন্ধে লইতে হইবে, নতুবা ঝিনুকে সেঁচিয়া নদীর জল কে কবে নিঃশেষ করিবার আশা করিতে পারে?

আমাদের দেশের কয়েকজন যুদ্ধজয়ী বীরের কথা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব তিনি সংগ্রহ

করিয়াছেন, কিন্তু লেখা জটিল বা নীরস হয় নাই। আমাদের দেশে এখন উল্টা ব্যবস্থা; বিদেশের কথা লইয়া আমরা ব্যস্ত—স্বদেশকে বিস্মৃতির অতল জলে আমরা ছাড়িয়া দিতে বসিয়াছি। ঈশা খাঁর কথা আমাদের যতটা জানার দরকার, নেপোলিয়নের কথাও ততটা জানার দরকার নাই। আমরা সীতারাম রায় ও প্রতাপাদিত্যকে লইয়া যে গৌরব করিব, সেকেন্দর, জেনাফেন কিম্বা জুলিয়াস্ সিজারের কথায়ও আমাদের ততটা গরিমার কারণ নাই। কিন্তু এদেশে শুধু যুদ্ধ-বীরগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এই পুণ্যক্ষেত্র জগৎগুরু ধর্ম্মবীর, দানবীর, কর্ম্মবীর, কবি, নৈয়ায়িক ও স্মৃতিকারগণের লীলাভূমি। ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জনই বঙ্গদেশের সমেৎশেখরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, পার্শ্বনাথ ১৮ বৎসর কাল রাঢ়দেশে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন; কত জয়দেব, ধোয়ী ও উমাপতির বীণা-নিক্কণে এদেশের কাব্যজগতে চিরবসন্ত বিরাজমান, কত সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ ও জগদীশের সূক্ষ্ম ন্যায়ের বিশ্লেষণে বঙ্গীয় মনস্বিতা প্রমাণিত হইয়াছে—ধর্ম্মজগতে চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তির বন্যা সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া লইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। এদেশের কৃষক যে সকল পালা-গানের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের অপূর্ব্ব কবিত্ব, কল্পতরুর মত এই নন্দন-কাননে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী, নয়ানচাঁদ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের মধ্যমণির প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। ধীমান বীতপালের ভাস্কর্য্য এককালে হিমাদ্রি অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যাঁহারা সূক্ষ্ম মসলিনের সৃষ্টি করিয়া শিল্পের অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহারা শুধু বস্ত্রবয়নে নহে, সোনা-রূপার শিল্পে, প্রস্তরের উপর খোদগারীতে, কন্থা সীবনে, রান্না-ঘরের উপাদেয় শত শত খাদ্য প্রস্তুত কার্য্যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন—তাঁহারা নাম-গোত্রহীন হইয়া বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছেন।

ইতিহাস-লক্ষ্মী মহাসমুদ্রের নীচে অভিশপ্ত হইয়া একা বসিয়া কাঁদিতেছেন; কোথায় তাঁহারা—যাঁহারা সমুদ্র-মন্থন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় উদ্ধার করিবেন? আমার কাছে বাঙ্গালীর হাতের প্রস্তর ও ধাতব মূর্ত্তি ও চিত্র এমন আছে, যাহা জগতের চক্ষু বঙ্গদেশের দিকে আকৃষ্ট করিবার শক্তি রাখে, কিন্তু জহুরী কোথায় যে তাহাদিগকে জগতের বড় বাজারে লইয়া আসিয়া যথাযোগ্য সম্মান দান করিবে? এখনও বাঙ্গলার প্রাচীন ভাণ্ডার-কোণে এমন অমূল্য চিত্র আছে যাহা দেখিলে র‍্যাফেলের ম্যাডোনাও বুঝি ম্লান হইয়া যায়; কিন্তু আমাদের হাতে ডঙ্কা নাই, কে তাহাদের কথা শুনাইবে?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদিগকে যাহা দেখাইয়াছেন সেইটুকু দেখিয়াই আমরা বুকে তাল ঠুকিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছি। কিন্তু এখন বায়ু ফিরিয়াছে, পাশ্চাত্যজগৎ রাজনৈতিক কারণে এখন আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। এখন মিস্ মেওর কথাই তাঁহারা শুনিবেন। আমাদের দেশ অসভ্য ছিল, ইহাই প্রমাণ করিতে অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমরা অক্ষম জাতি, যাঁহাদের ভরসায় মুখ উঁচু করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইব মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের আশ্রয়চ্যুত হইয়া আমরা একবারে হতাশ হইতে বসিয়াছি।

এখন নিজের কথা নিজের বলিতে হইবে। অপর শ্রোতা পাইব না, অপর বক্তা পাইব না। নিজেরা যদি নিজের কথা না বলি, তবে কোন মুরব্বীর আশা করিলে সুফল পাইব না। বাঙ্গালী জাতি যদি দাঁড়াইতে চান, তবে তাঁহাদের স্বীয় চরণযুগল ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। রাজনৈতিক অভিনয়-মঞ্চে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া উন্নতির পথে কতটা অগ্রসর হইব,—তাহা জানি না। বড় দুঃখে সেদিন গান্ধি বলিয়াছেন, ভারত-আকাশের কোন দিকে জাতীয় উষার একটুকু ছটা দেখা যাইতেছে না, কি লইয়া আমরা আশা করিব? যাহা শুনিতেছি,

তাহা কেবলই শরৎকালের শূন্যগর্ভ মেঘ-গর্জ্জন, এই কর্ম্মহীন স্থানের ভবিষ্যৎ নিবিড় কুহেলিকাচ্ছন্ন।

উপেন্দ্রবাবুর বইখানি পড়িয়া মনে হইল বাঙ্গালীর নিজের কথা কহিবার ইচ্ছা হইয়াছে—ইহা অতি শুভ লক্ষণ। অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এদেশে ছিল—যাহা লুপ্ত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র ও লক্ষণমালিকা এই দুইখানি পুস্তকে বঙ্গদেশের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ ছিল, তাহা এখন লুপ্ত। ত্রিপুরার রাজমালা কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী হইতে শ্রেষ্ঠতর ইতিহাস। এই রাজমালা বইখানিই বা কতজন বাঙ্গালী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন? আমার নিকট প্রাচীন কুচবিহারের একখানি ইতিহাস আছে, তাহাও ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অনেক পালা-গান, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও প্রাচীন দীঘি প্রভৃতি আছে, যাহার ঐতিহাসিক মূল্য এখনও অবিদিত। কত যুবক কর্ম্মের অভাবে হা-হুতাশ করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে কর্ম্মের আহ্বান আছে তাহাতে সাড়া দিবার যোগ্য কি একজন বাঙ্গালীও নাই? দশজন কর্ম্মী পাইলে যে আমাদের বহু কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

আমরা আশা করি উপেন্দ্রবাবুকে আমাদের ইতিহাসচর্চ্চার কার্য্যে আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইব। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তিনি বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য প্রকৃত একখানি পাঠ্য পুস্তক আমাদের হাতে দিয়াছেন। আশা করি তিনি বাঙ্গলার কথা ছাড়িয়া দিয়া আবার বহির্মুখ হইয়া বিশ্ব-ইতিহাসের চর্চ্চায় মনোযোগী হইবেন না।

৭, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সূচী

ভূমিকা

যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস নাই বলিয়া বিলাপ করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকেই দোষী বলিব। বাঙ্গলার ইতিহাসের অপর্য্যাপ্ত উপকরণ পড়িয়া আছে, এখন তাহার অনেকাংশ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আর দশ বৎসর পরে হয়ত তাহা থাকিবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ষ্টুয়ার্ট, মার্সম্যানের আদর জানেন, তাঁহারা যে গীত গাহিয়া যান, তাহার দোহার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের দেশ নিজের চোখে দেখিবার ক্ষমতা রাখেন না। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎচন্দ্র রায় তাঁহার মুক্ত হস্তের দান এবং অতুলনীয় ঐতিহাসিক কৌতূহল লইয়া বঙ্গের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কুমারবাহাদুরের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহাদের চেষ্টার ফল স্বরূপ রাজসাহির মিউজিয়ম্, গৌড়ীয় লেখমালা এবং রাজসাহির কোন কোন স্থান খননকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কার্য্য সুপ্রসার,—সমুদ্র তুল্য, দুই-একটি কূপ খননের দ্বারা আর কতটা সফলতার আশা করা যায়? আট-নয় শত বৎসর পূর্ব্বকার অগণ্য মালমসলা চারিদিকে পড়িয়া আছে,—মুষ্টি মুষ্টি করিয়া আনিলে তাহার কতটা উদ্ধার হইবে? সমস্ত জাতির জাগ্রত হইয়া এই বৃহৎ কর্ত্তব্যের দায়িত্বের ভার স্কন্ধে লইতে হইবে, নতুবা ঝিনুকে সেঁচিয়া নদীর জল কে কবে নিঃশেষ করিবার আশা করিতে পারে?

আমাদের দেশের কয়েকজন যুদ্ধজয়ী বীরের কথা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব তিনি সংগ্রহ

করিয়াছেন, কিন্তু লেখা জটিল বা নীরস হয় নাই। আমাদের দেশে এখন উল্টা ব্যবস্থা; বিদেশের কথা লইয়া আমরা ব্যস্ত—স্বদেশকে বিস্মৃতির অতল জলে আমরা ছাড়িয়া দিতে বসিয়াছি। ঈশা খাঁর কথা আমাদের যতটা জানার দরকার, নেপোলিয়নের কথাও ততটা জানার দরকার নাই। আমরা সীতারাম রায় ও প্রতাপাদিত্যকে লইয়া যে গৌরব করিব, সেকেন্দর, জেনাফেন কিম্বা জুলিয়াস্ সিজারের কথায়ও আমাদের ততটা গরিমার কারণ নাই। কিন্তু এদেশে শুধু যুদ্ধ-বীরগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এই পুণ্যক্ষেত্র জগৎগুরু ধর্ম্মবীর, দানবীর, কর্ম্মবীর, কবি, নৈয়ায়িক ও স্মৃতিকারগণের লীলাভূমি। ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জনই বঙ্গদেশের সমেৎশেখরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, পার্শ্বনাথ ১৮ বৎসর কাল রাঢ়দেশে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন; কত জয়দেব, ধোয়ী ও উমাপতির বীণা-নিক্বণে এদেশের কাব্যজগতে চিরবসন্ত বিরাজমান, কত সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ ও জগদীশের সূক্ষ্ম ন্যায়ের বিশ্লেষণে বঙ্গীয় মনস্বিতা প্রমাণিত হইয়াছে—ধর্ম্মজগতে চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তির বন্যা সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া লইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। এদেশের কৃষক যে সকল পালা-গানের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের অপূর্ব্ব কবিত্ব, কল্পতরুর মত এই নন্দন-কাননে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী, নয়ানচাঁদ বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের মধ্যমণির প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। ধীমান বীতপালের ভাস্কর্য্য এককালে হিমাদ্রি অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। যাঁহারা সূক্ষ্ম মসলিনের সৃষ্টি করিয়া শিল্পের অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহারা শুধু বস্ত্রবয়নে নহে, সোনা-রূপার শিল্পে, প্রস্তরের উপর খোদগারীতে, কন্থা সীবনে, রান্না-ঘরের উপাদেয় শত শত খাদ্য প্রস্তুত কার্য্যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন—তাঁহারা নাম-গোত্রহীন হইয়া বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছেন।

ইতিহাস-লক্ষ্মী মহাসমুদ্রের নীচে অভিশপ্ত হইয়া একা বসিয়া কাঁদিতেছেন; কোথায় তাঁহারা—যাঁহারা সমুদ্র-মন্থন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় উদ্ধার করিবেন? আমার কাছে বাঙ্গালীর হাতের প্রস্তর ও ধাতব মূর্ত্তি ও চিত্র এমন আছে, যাহা জগতের চক্ষু বঙ্গদেশের দিকে আকৃষ্ট করিবার শক্তি রাখে, কিন্তু জহুরী কোথায় যে তাহাদিগকে জগতের বড় বাজারে লইয়া আসিয়া যথাযোগ্য সম্মান দান করিবে? এখনও বাঙ্গলার প্রাচীন ভাণ্ডার-কোণে এমন অমূল্য চিত্র আছে যাহা দেখিলে র‍্যাফেলের ম্যাডোনাও বুঝি ম্লান হইয়া যায়; কিন্তু আমাদের হাতে ডঙ্কা নাই, কে তাহাদের কথা শুনাইবে?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদিগকে যাহা দেখাইয়াছেন সেইটুকু দেখিয়াই আমরা বুকে তাল ঠুকিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছি। কিন্তু এখন বায়ু ফিরিয়াছে, পাশ্চাত্যজগৎ রাজনৈতিক কারণে এখন আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। এখন মিস্ মেওর কথাই তাঁহারা শুনিবেন। আমাদের দেশ অসভ্য ছিল, ইহাই প্রমাণ করিতে অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমরা অক্ষম জাতি, যাঁহাদের ভরসায় মুখ উঁচু করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইব মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের আশ্রয়চ্যুত হইয়া আমরা একবারে হতাশ হইতে বসিয়াছি।

এখন নিজের কথা নিজের বলিতে হইবে। অপর শ্রোতা পাইব না, অপর বক্তা পাইব না। নিজেরা যদি নিজের কথা না বলি, তবে কোন মুরব্বীর আশা করিলে সুফল পাইব না। বাঙ্গালী জাতি যদি দাঁড়াইতে চান, তবে তাঁহাদের স্বীয় চরণযুগল ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। রাজনৈতিক অভিনয়-মঞ্চে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া উন্নতির পথে কতটা অগ্রসর হইব,—তাহা জানি না। বড় দুঃখে সেদিন গান্ধি বলিয়াছেন, ভারত-আকাশের কোন দিকে জাতীয় উষার একটুকু ছটা দেখা যাইতেছে না, কি লইয়া আমরা আশা করিব? যাহা শুনিতেছি,

তাহা কেবলই শরৎকালের শূন্যগর্ভ মেঘ-গর্জ্জন, এই কর্ম্মহীন স্থানের ভবিষ্যৎ নিবিড় কুহেলিকাচ্ছন্ন।

উপেন্দ্রবাবুর বইখানি পড়িয়া মনে হইল বাঙ্গালীর নিজের কথা কহিবার ইচ্ছা হইয়াছে—ইহা অতি শুভ লক্ষণ। অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এদেশে ছিল—যাহা লুপ্ত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র ও লক্ষণমালিকা এই দুইখানি পুস্তকে বঙ্গদেশের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ ছিল, তাহা এখন লুপ্ত। ত্রিপুরার রাজমালা কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী হইতে শ্রেষ্ঠতর ইতিহাস। এই রাজমালা বইখানিই বা কতজন বাঙ্গালী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন? আমার নিকট প্রাচীন কুচবিহারের একখানি ইতিহাস আছে, তাহাও ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অনেক পালা-গান, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও প্রাচীন দীঘি প্রভৃতি আছে, যাহার ঐতিহাসিক মূল্য এখনও অবিদিত। কত যুবক কর্ম্মের অভাবে হা-হুতাশ করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে কর্ম্মের আহ্বান আছে তাহাতে সাড়া দিবার যোগ্য কি একজন বাঙ্গালীও নাই? দশজন কর্ম্মী পাইলে যে আমাদের বহু কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

আমরা আশা করি উপেন্দ্রবাবুকে আমাদের ইতিহাসচর্চ্চার কার্য্যে আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইব। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তিনি বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য প্রকৃত একখানি পাঠ্য পুস্তক আমাদের হাতে দিয়াছেন। আশা করি তিনি বাঙ্গলার কথা ছাড়িয়া দিয়া আবার বহির্ম্মুখ হইয়া বিশ্ব-ইতিহাসের চর্চ্চায় মনোযোগী হইবেন না।

৭, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সূচী

বিজয় সিংহ

আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়—
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,

*   *   *   *

তুই কি না মাগো তা'দের জননী,
তুই কি না মাগো তা'দের দেশ ?

—দ্বিজেন্দ্রলাল

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, একদিন বঙ্গেশ্বর সিংহবাহুর রাজপ্রাসাদের এক নির্জ্জন প্রান্তে এক যুবক চিন্তাকুলভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। যুবক মহারাজ সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ। প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার করার অপরাধে কুমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি আদেশ—আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। কুমারের সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ আজ উৎকট দুশ্চিন্তায় অবসন্ন; তেজোব্যঞ্জক, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল মলিন; আয়ত চক্ষু দুইটি জলভারাক্রান্ত;

দেহের সমস্ত লাবণ্য যেন ঝরিয়া পড়িয়া নিশান্তের শশাঙ্কের মত তাঁহাকে নিষ্প্রভ, করুণ দেখাইতেছে।

কুমারের যুবক-বন্ধুগণ আসিয়া বলিল, "বিজয়, আমর মহারাজের এই অন্যায় আদেশ মানিব না। যে রাজা স্ত্রীর স্বার্থমূলক পরামর্শে নিরপরাধ পুত্রের মস্তকে মিথ্যা-কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তাঁহার রাজত্বে বাস করা আমরা পাপ মনে করি আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এই অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তোমাকে সিংহাসনে বসাইব। তোমার অনুমতির অপেক্ষায় মাত্র আছি।"

রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেনাপতিবৃন্দ চারিদিকে ভিড় জমাইয়া বলিতে লাগিল, "বিমাতার ষড়যন্ত্রে কুমার আজ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। কুমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। মহারাজ ন্যায়বিচার করেন নাই।"

সমবেতজনমণ্ডলীর সহানুভূতির উত্তরে কুমার বিজয় সিংহ একটু মৃদু হাসিলেন; পরে যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

বন্ধুগণ, পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন: পুরু, পিতার অনুরোধে তাঁহার জরা নিজের দেহের উপর আনন্দে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আমি পিতার আদেশ

অমান্য করিতে পারিব না—তা' সেই আদেশ ন্যায়ই হোক, আর অন্যায়ই হোক। পিতার আদেশ পালন করিতে যে বিপদ, যে দুঃখই আসুক—আমি আনন্দে বুক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিব।"

সকলে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আমরা তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তুমি যেখানে যাও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব। আমরা তোমার সঙ্গেই এ-রাজ্য ত্যাগ করিব।"

পরদিন বিজয় সিংহের বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। যুবরাজের অনুরক্ত দেশবাসীদের উদ্যোগে এক বিরাট সমুদ্রগামী রণতরী সংগৃহীত হইল। বিজয় সিংহ বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে সাতশত অনুচর সহ জাহাজে আরোহণ করিলেন। যাহারা তাঁহার অনুগমন করিতে পারিল না, তাহারা চোখের জল মুছিয়া সাগরতট হইতে শূন্যমনে গৃহে ফিরিল। আর কুমার বিলীয়মান তীরভূমির প্রতি একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া, সাশ্রুনেত্রে জননী জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

জাহাজ চলিল। গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, সাতশত বাঙ্গালী দিনের পর দিন ভারতমহাসাগরের নীল জলরাশি অতিক্রম করিতে করিতে চলিল। গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ নাই, পথের নিশ্চয়তা নাই,—কক্ষচ্যুত উল্কার মত বিশাল তরণীখানি উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে কেবলই ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন দূরে ক্ষীণ কলঙ্করেখাবৎ বেলাভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। দুঃসাহসিকের দল তীরে পৌঁছিয়া দেখিল—এক অপরূপ সৌন্দর্য্যময় দেশ। তীরভূমি হইতে সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর উচ্চ স্বর্ণচূড়া সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। চারিদিকে যেন বসন্তের আবহাওয়া; আকাশে-বাতাসে এক অপূর্ব্ব মাদকতা। বিজয় সিংহের অনুচরগণ তীরে অবতীর্ণ হইয়া জানিতে পারিল—এই বিচিত্র দেশের নাম লঙ্কা।

লঙ্কাজয়ের জন্য বিজয়ের বীর-হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বিজয় বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা এই রাজ্য জয় করিয়া এখানেই বাস করিব। তোমরা প্রস্তুত হও। আমি রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলাম।"

সাতশত বঙ্গবীরের শিরায় শিরায় উষ্ণরক্তস্রোত ছুটিল; বাণপূর্ণ তূণে পৃষ্ঠদেশ শোভিত হইল; কটিতে অসি ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল;—সমুন্নত বর্শা হস্তে তাহারা তীরে এবং জাহাজের উপর সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

লঙ্কারাজের বিশ্বাস ছিল—এ যক্ষের দেশ লঙ্কা কেহ অধিকার করিতে পারিবে না। তিনি সাতশত বাঙ্গালীর এই স্পর্দ্ধায় উপহাসের হাসি হাসিয়া, তাহাদের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিরাট সেনাদল পাঠাইলেন। বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতকায় হস্তী ও উচ্চ, তেজস্বী অশ্বসমূহে লঙ্কার তীরভূমি পরিপূর্ণ হইল।

লঙ্কার উপকূলে সেদিন নিরাশ্রয়, বিদেশী, সাতশত বাঙ্গালী মত্ত হস্তীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিজয় সিংহ

কালান্তক যমের মত লঙ্কা-সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। নিক্ষিপ্ত তীরের শন্‌শন্‌ শব্দ, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, সৈন্যের চীৎকার—এই সমস্ত মিলিয়া এক মহাপ্রলয়ের শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। লঙ্কারাজ, তাঁহার বহু সৈন্য নিহত হইতেছে শুনিয়া, স্বর্ণময় রাজছত্র মস্তকে দিয়া, শ্বেতহস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। লঙ্কার সেনাদল আবার নবতেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু বিজয় সিংহের অদ্ভুত সাহস ও অলৌকিক বীরত্বের কাছে তাহারা বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না। বিজয়ের নিক্ষিপ্ত এক বর্শার আঘাতে লঙ্কারাজ নিহত হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ বিজয় সিংহকে দৈববলে বলীয়ান মনে করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। বিজয় সিংহ লঙ্কা অধিকার করিলেন। লঙ্কার রাজপ্রাসাদে, দুর্গভালে, বাংলার রাজপতাকা উড়িল।

বিজয় সিংহ লঙ্কায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বহু দাসদাসী সহ পাণ্ড্য-দেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। লঙ্কাবাসীর উপর তাঁহার এতদূর প্রভাব জন্মিল যে, তাহারা তাঁহার পদবী অনুসারে লঙ্কার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম রাখিল—সিংহল, এবং প্রচলিত ভাষার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হইল—সিংহলী। লঙ্কার ইতিহাসে বিজয় সিংহের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

মহারাজ শশাঙ্ক

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে, মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক মগধের বিখ্যাত গুপ্তবংশের সন্তান। গুপ্তবংশের প্রাচীন গৌরব বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। রাঢ়দেশে কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী ছিল। গুপ্তবংশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লোকসমাজে জ্ঞাপন করিবার জন্য, তিনি নরেন্দ্রগুপ্ত উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

থানেশ্বরের মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন পিতার মৃত্যুর পর তখন সবে-মাত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন। হূণবিজয়ের সমস্ত ক্লান্তি তখনও পরিপূর্ণ বিশ্রামে অপনীত হয় নাই। হঠাৎ কান্যকুব্জ হইতে সংবাদ আসিল—তাঁহার ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মা, মালবরাজ দেবগুপ্ত-কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন, কান্যকুব্জের রাজসিংহাসন শত্রুকবলিত হইয়াছে ও তাঁহার পরমস্নেহপাত্রী একমাত্র ভগ্নী রাজ্যশ্রী শত্রু-কারাগারে শৃঙ্খলিতা বন্দিনী। একমাত্র ভগ্নীর এই দুর্দ্দশায় রাজ্যবর্দ্ধন একেবারে দুঃখে, শোকে

হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই তাঁহার বুকে দুর্জ্জয় ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিরাট সৈন্যদলের সহিত কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করিলেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের আগমনসংবাদে দেবগুপ্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। একে হূণবিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা রাজ্যবর্দ্ধন, তারপর অগণিত সৈন্য, সর্ব্বোপরি প্রতিহিংসার তীব্র উন্মাদনা;—এই তিনের সংমিশ্রণে হয়ত তিনি চূর্ণ হইয়া যাইবেন এবং এই পরাজয়ই হয়ত তাঁহার চরমপতনের সূচনা করিবে। বহুচিন্তার পর দেবগুপ্ত গৌড়েশ্বর মহাবীর শশাঙ্কের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শশাঙ্ক সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া বহু সৈন্য সহ কান্যকুব্জে যাত্রা করিলেন।

ইতিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া ভীম-পরাক্রমে দেবগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন। মহারাজ শশাঙ্ক তখনও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দেবগুপ্ত পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সেনাপতি ভণ্ডীর সহিত থানেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। দুষ্টগ্রহ মালবরাজকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জের রাজকার্য্যে আবার শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন—গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক বিপুল সেনাদল সহ কান্যকুব্জে উপস্থিত; উদ্দেশ্য—কান্যকুব্জ আক্রমণ। রাজ্যবর্দ্ধন থানেশ্বরে সংবাদ দিতে পারিলেন না, অন্য কোন সাহায্যের জন্য চেষ্টাও

করিতে পারিলেন না,—তাঁহার সহিত যে সেনাদল ছিল, তাহাই লইয়া শশাঙ্কের সম্মুখীন হইতে হইল।

সুদূর কান্যকুব্জের রণক্ষেত্র সেদিন বাঙ্গালীর শ্যামভুজের অমিতবিক্রমে কাঁপিয়া উঠিল। মহারাজ শশাঙ্ক স্বয়ং সৈন্যের পুরোভাগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনবৎ বর্ণ, উন্নত দেহ, শালপ্রাংশু ভুজদ্বয়, স্কন্ধবিলম্বিত কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশরাশি, প্রশস্ত ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত দেখাইতে লাগিল। বাঙ্গালী সৈন্যগণের মুহুর্মুহু 'হর হর বম্ বম্' শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, আর এক এক বার থানেশ্বর-কান্যকুব্জের সৈন্যগণের স্পর্দ্ধিত বক্ষ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্দ্ধন প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু বঙ্গেশ্বরের শৌর্য্যের কঠিন প্রস্তরে তাঁহার সমস্ত শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। রাজ্যবর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। মহারাজ শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন। বাংলার রাজপতাকা কান্যকুব্জে উড়িল।

যুদ্ধ শেষ হইলে, মহারাজ শশাঙ্ক বীরোচিত ঔদার্য্যের সহিত রাজ্যবর্দ্ধনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া বহুসমাদরে নিজাবাসে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। গৃহের প্রবেশদ্বারে হঠাৎ মুক্ত অবস্থায় রাজ্যবর্দ্ধনকে দেখিয়া, তিনি পলায়ন করিতেছেন ও পুনরায় তাঁহাকে বন্দী করা অসম্ভব এই অনুমান করিয়া একজন দ্বাররক্ষী, শশাঙ্কের অজ্ঞাতসারে, তাহার হস্তস্থিত

উন্মুক্ত তরবারি আমূল তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিল। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণশূন্য রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। নিরস্ত্রবন্দীহত্যার দুরপনেয় কলঙ্ক চিরকালের মত শশাঙ্কের মাথায় চাপিয়া রহিল।

শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে সসম্ভ্রমে, উপযুক্ত রক্ষী সহ থানেশ্বরে তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তারপর এক সামন্তের হস্তে কান্যকুব্জের শাসনভার অর্পণ করিয়া বিজয়োল্লাসে গৌড়ে ফিরিলেন।

শশাঙ্কের বীরত্বে, রাজনীতিজ্ঞানে, দক্ষতায়, বঙ্গ-সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কামরূপ ব্যতীত সমস্ত উত্তর-পূর্ব্ব ভারত শশাঙ্কের পদানত হইল। উড়িষ্যার দক্ষিণে কঙ্গোদমণ্ডলে শশাঙ্কের বিজয়নিশান উড়িল। মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত মহারাজ শশাঙ্ক ভারতের রাজনৈতিক আকাশে জ্বলিতে লাগিলেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যা বহিতেছিল। বিরাট বৌদ্ধপ্লাবনে হিন্দুধর্ম্ম তৃণের মত ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু বঙ্গদেশে মহারাজ শশাঙ্ক হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বজা সগর্ব্বে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিলেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—যতদিন তাঁহার ভ্রাতৃহন্তা, গৌড়েশ্বর শশাঙ্ককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারিবেন, ততদিন দক্ষিণ-

হস্ত দ্বারা আহার্য্য মুখে তুলিবেন না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন বঙ্গ-অভিযানের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা একবার শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় এবার তিনি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিলিত হইলেন। সমস্ত বৌদ্ধভারত ষড়যন্ত্র করিয়া থানেশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষাবলম্বন করিল।

বীরকেশরী শশাঙ্ক বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমস্ত বৌদ্ধনরপতিদিগকে স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষাবলম্বনকারী, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের বৌদ্ধধর্ম্মযাজকদিগকে তিনি দস্তুরমত শাসন করিয়া দিলেন; তারপর, এই সমবেতশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য বিপুল যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন।

বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া শশাঙ্কের পতাকাতলে মিলিত হইতে লাগিল। সারা-বাংলা রণোল্লাসে মাতিয়া গেল। মহারাজ শশাঙ্ক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য, শেষরক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে অগ্রসর হইলেন।

ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে আগুন আর নিভিল না। গৌড়েশ্বর অটল, অচলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়ে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ছয়বৎসরব্যাপী যুদ্ধে প্রভূত অর্থক্ষয় হওয়ায় শশাঙ্কের

রাজকোষ অর্থশূন্য হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু শশাঙ্ক তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বহুলপরিমাণে রজতমিশ্রিত স্বর্ণে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত অর্থকষ্ট হইতে নিস্তারলাভ করিলেন।

যুদ্ধের শেষ অবস্থায়, হঠাৎ পরলোকের ডাক শশাঙ্কের নিকট উপস্থিত হইল। গৌড়কেশরী মঙ্গলময়ের নিঃশব্দ আহ্বানে সমস্ত যুদ্ধায়োজন ফেলিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। বাংলার পূর্ণশশাঙ্ক অস্তমিত হইল; তাহার ভাগ্যাকাশ আবার গভীর আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু শশাঙ্কের জীবিতাবস্থায় বাংলার বীরত্বগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হইল না।

মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল

সমস্ত উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার জন্য মহারাজ শশাঙ্ক যে বিপুল সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রায় দুইশত বৎসর পরে, ধর্ম্মপালদেব সে সাধনাকে সিদ্ধির সাফল্যে মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে লইয়া এক বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্য গঠন করিবার যে ব্রত শশাঙ্ক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল বিজয়োল্লাসে তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। বাংলায় তখন এক গৌরবময় যুগ। বাঙ্গালীর প্রাণে তখন বঙ্গের বাহিরে রাজ্যবিস্তারের জন্য একটা বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এক বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠার কল্পনায় বাঙ্গালী আত্মহারা হইয়া দিগ্বিদিকে ছুটিয়াছিল।

দীর্ঘকাল অরাজকতা ভোগ করিয়া ও বহু অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বঙ্গের প্রজাবৃন্দ গোপালদেবকে সাগ্রহে ডাকিয়া আনিয়া বাংলার রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিল। তাঁহার রণনীতিকুশলতায়, সুশাসনে ও দক্ষতায় আবার বাংলায় শান্তি ফিরিয়া আসিল, আবার প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল এবং বারবার বৈদেশিক আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, তাহারা দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতিতে

মনোনিবেশ করিল। গোপালদেবের মৃত্যুর পর, দেদ্দদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালদেব অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ধর্ম্মপালের রাজ্যভারগ্রহণের পরই কান্যকুব্জের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কান্যকুব্জের সিংহাসন লইয়া বহুদিন হইতে যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহারই ধূমায়িত বহ্নি তখন একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়া চক্রায়ুধকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। প্রবল-প্রতাপশালী ইন্দ্রায়ুধের সহিত সম্মুখসংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সাহস না করিয়া, চক্রায়ুধ গৌড়েশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপালের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। দেশজয়ের যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এতদিন ধর্ম্মপাল মনে-মনে পোষণ করিতেছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার পক্ষে এক মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি শরণাগত চক্রায়ুধকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিলেন।

উত্তরাপথ-অভিযানের সংবাদে সারা-বাংলা তোলপাড় হইয়া উঠিল। নবজাগ্রত জাতীয়চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী এই দুঃসাহসিক সমরাভিযানে মাতিয়া উঠিল। দেশলক্ষ্মীর গলদেশ বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিবার জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগিল। দেশে দেশে বাঙ্গালীর বাহুবলের গুণকীর্ত্তন, বাংলার গর্ব্বোন্নত

রাজপতাকার তলে 'নতশিরে আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন রাজগণের মিলন, বাংলাকেই আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি স্বীকার করিয়া, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান-শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই সার্ব্বভৌমত্ব প্রদান—এই চিন্তা, আদর্শ ও কল্পনায় বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপাল ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। ধর্ম্মপাল এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, শুভদিনে, বিরাটবাহিনীর সহিত চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উত্তরাপথে যাত্রা করিলেন।

কান্যকুব্জের নিকটে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে, আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত নরপতিই ইন্দ্রায়ুধের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে এবং সদলবলে ধর্ম্মপালকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছে। স্বদেশ হইতে বহুদূরে, অগণিত, মহাশক্তিশালিশত্রুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও ধর্ম্মপালের বীর-হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রাণে এক দুর্জ্জয় অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল। আজ যদি তিনি আশ্রিতরক্ষণে অসমর্থ হন এবং এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া পরাজয়ের ভয়ে আবার বাংলায় ফিরিয়া আসেন, তবে সমস্ত রাজন্যসমাজে তিনি ভীরু কাপুরুষ বলিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিবেন। তাহা অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তের রৌদ্রদীর্ণ প্রান্তরে তরবারি হস্তে চিরদিনের মত বীরোচিত শয্যাগ্রহণই অধিক প্রার্থনীয়। বাংলার বীরত্বাভিমান রক্ষার

জন্য, আশ্রিতরক্ষারূপ ধর্ম্মপালনের জন্য, ঐকটা প্রবল উচ্চাশার তীব্র উত্তেজনায়, ধর্ম্মপাল একে একে প্রতিরোধকারী নরপতিদিগকে আক্রমণ করিলেন।

ধর্ম্মপালের অদ্ভুত সাহস, সেনাচালনকৌশল, সমর-নৈপুণ্য, বাঙ্গালীর বাহুবলের যশ-সৌরভ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া দিল। ধর্ম্মপালের ভীষণ পরাক্রমের নিকট বাধাপ্রদানকারী রাজন্যবর্গ একে একে উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণিবায়ুর মুখে নবীনশষ্পরাজির মত কোথায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মপালদেব পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব প্রভৃতি দেশের নরপতিগণকে পরাজিত করিলেন। ধর্ম্মপালের নামে আর্য্যাবর্ত্তের ভূপালগণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। প্রতিরোধকারী নরপতিগণকে পদানত করিয়া, বিজয়দর্পে সমস্ত উত্তরাপথ কাঁপাইয়া, ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ ধর্ম্মপালের বিজয়সংবাদে ভীত হইয়া ও যুদ্ধের ফল বিপজ্জনক হইতে পারে অনুমান করিয়া পলায়ন করিলেন এবং গুর্জ্জররাজ নাগভট্টের শরণাপন্ন হইলেন। ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন।

চক্রায়ুধকে সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধর্ম্মপাল এক বিরাট অভিষেক-উৎসবের আয়োজন করিলেন। স্বর্ণমণ্ডিত চন্দ্রাতপতলে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। ধর্ম্মপাল সভার

মধ্যস্থলে বহুমূল্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শিরে মণিমাণিক্যখচিত রাজছত্র শোভা পাইতে লাগিল। সুসজ্জিত, সশস্ত্র অনুচরগণ উভয়পার্শ্ব হইতে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে এক সিংহাসন চক্রায়ুধের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। বামপার্শ্বে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের বিজিত রাজন্যবর্গ নতশিরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধর্ম্মপালদেবের আদেশে বৃদ্ধ পাঞ্চাল-পুরোহিতগণ স্বর্ণকলস হইতে পূত অভিষেকবারি চক্রায়ুধের মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বৈতালিকগণ ধর্ম্মপালের বীরত্ব ও যশোগাথা সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মাঙ্গলিক যন্ত্রসঙ্গীতে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। বিজিত রাজগণ অবনত-মস্তকে সাধু সাধু শব্দে চক্রায়ুধের অভিষেক অনুমোদন করিলেন। বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপালের নাম আর্য্যাবর্ত্তের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহারাজ ধর্ম্মপাল জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন। বহুপথ অতিক্রম করিয়া বাংলার সীমান্তপ্রদেশে যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সংবাদ পাইলেন যে, নাগভট্ট কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়াছেন। এই সংবাদে ধর্ম্মপাল সুবিজ্ঞ রাজনীতিকের মত বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার

কান্যকুব্জের অভিমুখে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। শত্রুকবলিত কান্যকুব্জের উদ্ধারসাধন না করিলে তাঁহার ব্যয়সঙ্কুল অভিযান নিষ্ফল হইবে, বিজয়শ্রী ম্লান হইয়া যাইবে, আর বাঙ্গালীর বাহুবলের যশোগাথা আর্য্যাবর্ত্তের নরনারী-কণ্ঠে সুউচ্চে গীত হইবে না। সেই ক্লান্ত, শ্রান্ত গৌড়ীয় সেনাদলকে লইয়া ধর্ম্মপাল আবার নবতেজে কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করিলেন। দিবারাত্র বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে সহসা একদিন সম্মুখে দেখিলেন, অগণিত গুর্জ্জরসেনা তাঁহার পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ধর্ম্মপাল বিশাল গুর্জ্জরবাহিনী ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পথশ্রান্ত, অবসন্ন বঙ্গীয় সেনা অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে না পারিয়া বহুদূর পশ্চাতে হটিয়া আসিল। সম্মুখে অগ্রসর হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধর্ম্মপালদেব এক বিশাল প্রান্তরে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট চক্রায়ুধও সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

ধর্ম্মপাল দেখিলেন, এই সৈন্য লইয়া তিনি নাগভট্টের সহিত সম্মুখযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাংলায় ফিরিয়া সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া পুনরায় আসিতে হইলে অধিক সময় ব্যয়িত হইবে; ইতিমধ্যে নাগভট্ট নববিজিত রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া ফেলিবেন এবং সর্ব্বোপরি প্রবলপ্রতাপশালী গুর্জ্জররাজের সহিত যুদ্ধের ফলাফলও অনিশ্চিত।

ধর্ম্মপাল ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, যদি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বাংলার পতাকামূলে একত্র করিতে হয়, তবে দক্ষিণাপথের একচ্ছত্রাধিপতি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। রাষ্ট্রকূটরাজগণের সহিত পালরাজগণের বংশানুক্রমে একটা সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান ছিল। নাগভট্টের পিতা বৎসরাজ যখন একবার গৌড় আক্রমণ করেন, তখন গোবিন্দের পিতা ধ্রুবধারাবর্ষ বাংলার পক্ষাবলম্বন করিয়া বৎসরাজকে পরাজিত ও মরুভূমিতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেব ও চক্রায়ুধ দাক্ষিণাত্যে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের অবস্থা ভালরূপে জ্ঞাপন করিয়া, গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ পরমসমাদরে গৌড়েশ্বরকে বহুসম্মানিত অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার শেষশক্তি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া ধর্ম্মপালকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। বঙ্গের সহিত চিরদিনের মত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে, গোবিন্দ, রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবলনামক এক রাজার কন্যা রণ্ণাদেবীকে ধর্ম্মপালদেবের সহিত বিবাহ দিলেন। তারপর, গোবিন্দ বহু সৈন্য ও সামন্তগণ সহ নাগ-ভট্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের সেনাদলও গোবিন্দের সহিত যোগদান করিল। অবশেষে এই বিরাট সম্মিলিত-বাহিনী বীরদর্পে সমস্ত উত্তরভারত কাঁপাইয়া কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইল।

নাগভট্ট সমস্ত কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া গোবিন্দ ও ধর্ম্মপালের আক্রমণ প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। নাগভট্ট, ভারতবর্ষের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ও সেনাপতিদ্বয়ের যুগপৎ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া তাঁহার পিতা বৎস-রাজের মত তিনিও পলায়ন করিয়া মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দ ও ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন। জামাতাকে কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চক্রায়ুধ আবার কান্য-কুব্জের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং ধর্ম্মপালদেবের সামন্তরূপে কান্যকুব্জরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে ধর্ম্মপাল মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বরপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিবার যে আশা এতদিন ধর্ম্মপাল মনে-মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা সফল হইল। বাংলার গর্ব্বোন্নত রাজপতাকাকে উত্তরভারতের নরপতিগণ নতশিরে অভিবাদন করিলেন।

উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ড তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবপালদেবের একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—"দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সেই নরপতির (ধর্ম্মপালের) ভৃত্যবর্গ কেদার-তীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং

সাগরসঙ্গমে তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসদৃশ ভ্রাতৃগতপ্রাণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পাল সর্ব্বদাই ধর্ম্মপালকে, ছায়ার মত অনুগমন করিয়া রাজকার্য্য, যুদ্ধকার্য্য প্রভৃতিতে সাহায্য করিতেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় কনিষ্ঠও প্রবলপ্রতাপশালী বীর ছিলেন। তিনি 'জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনে থাকিয়া একচ্ছত্র-শাসন-সংস্থিত দশদিক শত্রু-পতাকিনীশূন্য করিয়াছিলেন।' "

ধর্ম্মপালদেবের মত প্রজাবৎসল, জনপ্রিয় সম্রাট্ খুব কমই বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি বুঝিতেন, প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করাই রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য; রাজ্য ত প্রজার, তিনি তাহার রক্ষকমাত্র। জনসাধারণের প্রীতি ও আগ্রহই যে পালবংশকে গৌড়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এ কথাটি ধর্ম্মপাল কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—"সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, গৃহচত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়স্থানে বণিকসমূহ কর্ত্তৃক এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া থাকিত।"

ধর্ম্মপাল সেনাবল ও নৌবল উভয় বলেই বিপুলবলশালী ছিলেন। খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসনে বাংলার

তৎকালীন সমরশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার 'নাসীর' নামক সেনাসমূহের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাইত; গঙ্গাবক্ষে তাঁহার 'নানাবিধ নৌবাটক' 'সেতুবন্ধনিহিত' শৈলশিখরশ্রেণী-রূপে সকলের মনে ভ্রম জন্মাইত, তাঁহার 'ঘনাঘন' নামক, রণদুর্ম্মদ, ঘাতুক রণহস্তিসমূহ দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে লোকের মনে 'জলদসময়সন্দেহ' উপস্থিত হইত।

বিবিধশাস্ত্রবেত্তা ও অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ শাণ্ডিল্যবংশীয় গর্গদেব তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং রাজত্বের শেষভাগে গর্গদেবের সুযোগ্য পুত্র দর্ভপাণি গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সুচিন্তিত উপদেশ এবং বাক্‌পালের ভুজবিক্রম-রূপ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, আমরণ আর্য্যাবর্ত্তের মহারাজচক্রবর্ত্তিপদ অলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালীর জয়গানে সমস্ত ভারত পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালদেবের সময়ে গৌড়ীয় প্রস্তর-শিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। বাংলার বহুস্থানে প্রাপ্ত নানা প্রকারের ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও নীরব ভাষায় সে সাক্ষ্য দিতেছে!

কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোক ও ভীম

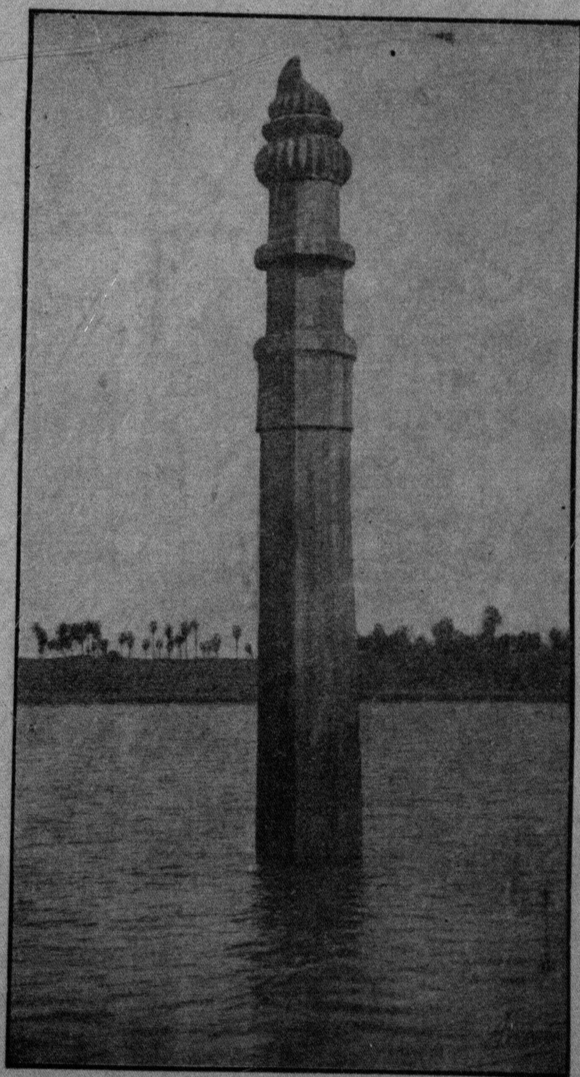
বাংলা চিরদিনই বীরপ্রসূ। ইহার শস্যশ্যামল, স্নিগ্ধ মাটিতে কেবল মাত্র কবি, দার্শনিকই জন্মায় না, এখানে উচ্ছ্বসিতস্রোতস্বিনীর জলধারাসিক্ত কোমল মাটির বুকে যুগে যুগে দুর্জ্জয় বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাংলার শ্যামায়মান প্রান্তরের ঢলঢল লাবণ্যের মধ্যে কাঠিন্যের রুদ্রমূর্ত্তি লুক্কায়িত; মেঘমেদুর আকাশের বুকের মধ্যে বজ্র নিহিত; দিনান্তরম্য, দিগন্তবিততশস্যক্ষেত্রচুম্বী বাতাসের পিছনে অগ্নির লেলিহান শিখা বর্ত্তমান। বাঙ্গালীর সুকুমার শ্যাম দেহখানি মুহূর্ত্তে পর্ব্বতশৃঙ্গের মত কঠোর হইতে পারে; ভাবোচ্ছল, প্রেমোদ্বেল, উদার কবি-হৃদয়ে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের প্রলয়সঙ্গীত বাজিতে পারে; গৃহসুখপ্রিয় বাঙ্গালী তাহার চিরাভ্যস্ত আরাম ও বিশ্রাম দূরে ফেলিয়া, যে-কোন মুহূর্ত্তে অনন্ত-ভয়সঙ্কুল মরু-অভিযানে বাহির হইতে পারে কিংবা সীমাহীন আকাশের নিম্নে, দিগন্তপ্রসারিত জলরাশির উপর ভাসিতে ভাসিতে, পৃথিবীর কোন অজানা পরপারে, প্রহরীবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত কামনার ধনকে উদ্ধার করিবার জন্য দুঃসাহসিক নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিতে পারে। কাঠিন্য ও কোমলতার, শৌর্য্য ও মধুরতার, ভাবুকতা ও কার্য্যক্ষমতার, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের, বজ্র ও মেঘের এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন পৃথিবীর আর কোন

জাতিতে হয় নাই। বাঙ্গালীর এই স্বভাবসিদ্ধ শৌর্য্য-বীর্য্য, এই সমরনৈপুণ্য কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হয় নাই। সমাজে তথা-কথিত উচ্চশ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও যুগে যুগে বহু বীরপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। একদিন এই সব অপেক্ষাকৃত অবনত শ্রেণীর মধ্য হইতে, দলে দলে ভীমপরাক্রম যোদ্ধৃবৃন্দ বাংলার রাজকীয় সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা বাংলার বাহিরে, রণক্ষেত্রে তাহাদের অদ্ভুত রণকৌশল দেখাইয়া, গৌড়েশ্বরগণের জন্য জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়াছে এবং তাহাদের বাহুবলের যশ-সৌরভে সমস্ত ভারত আমোদিত করিয়াছে।

বঙ্গদেশে কৈবর্ত্ত দুইপ্রকার—জালিক ও হালিক। জালিকগণ ধীবর ও অনাচরণীয়। হালিকগণ জলাচরণীয় ও সাধারণতঃ কৃষিজীবী। এই হালিক বা চাষী কৈবর্ত্তের বর্ত্তমান নাম মাহিষ্য। এই চাষী কৈবর্ত্তজাতি একসময়ে প্রবলশক্তিসম্পন্ন যুদ্ধনিপুণ জাতি ছিল। বাংলার নানা অংশে মোগলযুগ পর্য্যন্ত ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, বাংলায় এই চাষী কৈবর্ত্তজাতির মধ্যে, নিদাঘসূর্য্যের মত তেজস্বী ও মত্তহস্তীর মত ক্ষমতাশালী দুইজন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম দিব্বোক ও ভীম। দ্বিতীয় মহীপালদেব তখন বাংলার রাজসিংহাসনে। মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়া পালবংশের চিরাচরিত প্রথাকে পদদলিত করিলেন। পালবংশের

প্রথম রাজা গোপালদেবের সময় হইতে সকল রাজাই মন্ত্রীদের পরামর্শ লইয়া রাজ্যকার্য্য পরিচালন করিয়াছেন। পালবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ধর্ম্মপাল, বিচক্ষণ মন্ত্রী গর্গের মন্ত্রণাবলে 'অখিলদিগের স্বামী'-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দিগ্বিজয়ী দেবপাল, তাঁহার বৃহস্পতিতুল্য মন্ত্রীকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া নিজে 'সচকিতভাবে' সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্তু, মহীপাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, মন্ত্রীদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া, স্বেচ্ছামত কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেই দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসনে রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্বার্থান্বেষী নীচমনা লোকেরা দুর্ব্বলচিত্ত রাজার নিঃস্বার্থ পরামর্শদাতা সাজিয়া তাঁহাকে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে লাগিল। তাহারা মহীপালকে বুঝাইল যে, তাঁহার ভ্রাতা রামপাল সর্ব্বসম্মত কৃতী ও অশেষগুণের অধিকারী; পরিণামে সে মহাশক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হইবে। সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক তাহার রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন। মহীপাল কপট বন্ধুগণের এই পরামর্শ শুনিয়া শাঠ্যপ্রয়োগে রামপালকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। মহীপালের যথেচ্ছশাসনে ক্রমে বাংলায় ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে, জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন, কৈবর্ত্তনায়ক দিব্বোক বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মহীপাল চতুরঙ্গবল সহ বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা



কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোকের জয়স্তম্ভ

করিলেন। দিব্বোকও বহু সৈন্য সহ মহীপালের সম্মুখীন হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল। কৈবর্ত্তপতির অলৌকিক বীরত্বে বঙ্গেশ্বরের সমস্ত সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল এবং মহীপাল পরাজিত ও নিহত হইলেন। দিব্বোক সমস্ত উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া স্বাধীনভাবে দেশশাসন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিবার স্মৃতিচিহ্নরূপে, বীর্য্যবান জননায়ক দিব্বোক বিজয়-গর্ব্বে যে সমুন্নত জয়স্তম্ভ উত্তরবঙ্গের এক সুপ্রশস্ত সরোবরের বুকে প্রোথিত করিয়াছিলেন—আজও তাহা উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত ভারতে কৈবর্ত্তজাতির সমর-নৈপুণ্য ও কৈবর্ত্তপতি দিব্বোকের অসামান্য বাহুবলের পরিচয় দিতেছে।

দিব্বোকের মৃত্যুর পর, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম উত্তরবঙ্গের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট, রাজধানী হইতে বিতাড়িত ভ্রাতৃদ্বয়—রামপাল ও শূরপাল নানা স্থানে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইয়া, অবশেষে পদ্মা-ভাগীরথীর মধ্যস্থিত 'ব'-দ্বীপে কোনমতে নিজেদের পৈতৃক রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন। শূরপাল কয়েকদিন মাত্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর রামপাল ভ্রাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রামপাল রাজা হইয়া, পিতৃব্যের মত দুর্জ্জয় বীর ভীমের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভূমির উদ্ধার সাধন করা অসম্ভব মনে করিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কিরূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন, পুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণের সহিত তিনি সদাসর্ব্বদা এই আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহীপালের স্বেচ্ছাচারিতা ও কুশাসনে সামন্তগণ বিমুখ হইয়া ছিলেন। রামপাল বুঝিলেন, ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত পালবংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে না। তাই তিনি সামন্তগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন এবং কৈবর্ত্তজাতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। রামপালের মনোরম ব্যবহারে সামন্তগণ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার পিতৃভূমি উদ্ধারার্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। পূর্ণ উদ্যমে রামপাল সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাতিক, অশ্ব ও গজারোহী বহু সৈন্য সংগৃহীত হইল। রামপাল তাহাদের পারিশ্রমিক-স্বরূপ নদীতীরস্থ বহু জমী ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন।

সৈন্যসংগ্রহ শেষ হইলে, কৈবর্ত্তরাজের শক্তি পরীক্ষার জন্য রামপালদেব তাঁহার মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিবরাজদেবের নেতৃত্বে ভীমের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ গঙ্গা পার হইয়া ভীমের রাজ্যে গমন করিল। তাহারা ভীমের অধিকৃত গ্রামগুলি একের পর এক আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু শিবরাজদেব কোন ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই

ভীমকর্ত্তৃক প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শিবরাজদেব স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। রাজধানীতে আসিয়া শিবরাজ রামপালকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইয়াছে। রামপাল অবিলম্বেই বুঝিলেন যে, সামান্য কয়েকখানি গ্রাম আক্রমণে ভীমের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই এবং তিনি তাঁহার অধিকারে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তখন রামপাল তাঁহার 'জনকভূ' বরেন্দ্রী-অধিকারের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ভীমের সমস্ত শক্তি চূর্ণ করিয়া গৌড়রাজের বংশধরকে তাঁহার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, অগণিত মিত্র নরপতি ও সামন্তগণ রামপালের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। মগধ, উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি স্থান হইতে নরপতিগণ সসৈন্যে রামপালের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তারপর এই সম্মিলিত-বাহিনী 'নৌকামেলক' বা নৌসেতু দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়া ভীমের রাজ্যে উপস্থিত হইল।

কৈবর্ত্তরাজ ভীম, শিবরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই ভীষণ যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে প্রজাপুঞ্জের রক্ষা, জলপ্লাবন হইতে দুর্গমূল ও রাজধানী রক্ষা ও সাধারণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য, তিনি রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে উত্তর সীমা পর্য্যন্ত এক বিশাল মৃন্ময়

প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন। আজিও সেই সমুন্নত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ "ভীমের জাঙ্গাল" নামে উত্তরবঙ্গে পরিচিত।

মিত্র ও সামন্ত-চক্রসহ রামপালকে বরেন্দ্রভূমিতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া ভীম কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, কৈবর্ত্তসেনা-দলের সহিত ক্ষিপ্রবেগে তাঁহার আগমন প্রতিরোধ করিলেন। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ভীমের সহিত রামপালের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। ভীমের বিক্রমে বিপক্ষের রাজগণ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; রামপালের হৃদয় বারে বারে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তুলনায় কৈবর্ত্তরাজের সৈন্য অপেক্ষা পালরাজের সৈন্যসংখ্যা দশগুণ অধিক হইলেও, ভীমের প্রচণ্ড আক্রমণে এক এক বার তাহারা হটিয়া যাইতে লাগিল। এক মদমত্ত রণকুঞ্জরে আরোহণ করিয়া, বিশাল বর্শা হস্তে দৈত্যরাজ বৃত্রের মত ভীম, ভৈরবহুহুঙ্কারে শত্রু-সৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমের হস্তে পালরাজের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয় হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলিল। রামপালের সৈন্যের সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হইলেও তাহারা সমানভাবেই যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ভীমের সেনাদলের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধ করায়, রণ-শ্রমে ভীষণ ক্লান্ত হইয়া, অবসন্নদেহে কৈবর্ত্তপতি ভীম কিছুকালের জন্য হস্তীর উপর মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। রামপালের সৈন্যগণ, এই মহাসুযোগে পঙ্গপালের মত চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া আহত, কম্পমান হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে লুপ্তচেতন কৈবর্ত্তরাজকে নামাইয়া লইয়া শিবিরে প্রস্থান করিল। মূর্চ্ছান্তে চোখ মেলিয়া ভীম দেখিলেন—তিনি শত্রুশিবিরে বন্দী। ভীমের বন্দী হওয়ার সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। ভয়চকিত সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পালরাজের সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে ভীমের পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিল। বিত্তপাল নামে রামপালের এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ভীম কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। ভীমের প্রিয়-বন্ধু ও সেনাপতি হরি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন এবং বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে একত্র করিয়া পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। হরি অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিলেও মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বেশীক্ষণ টিকিতে পারিলেন না। যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু-ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলে, রামপালের পুত্র রাজ্যপাল বহু সৈন্য সহ একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। ভীম ও হরি বন্দী হইলে রামপাল ভীমের রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করিলেন এবং রণদুর্ম্মদ কৈবর্ত্ত-

সেনাগণকে স্বীয় সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন। বঙ্গে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের অবসান হইল; বঙ্গের কৈবর্ত্তজাতির শৌর্য্যবহ্নি একবার কয়েক বৎসরের জন্য শতসূর্য্যের মত জ্বলিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। কিছুদিন পরে তাম্র-শাসনের কবি লিখিলেন,—"রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণবধান্তে জনকনন্দিনীকে লাভ করিয়াছিলেন, রামপালদেবও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীমনামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি লাভে ত্রিজগতে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

এক শোচনীয় দৃশ্যে ভীমের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল। শক্তিমানের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদকারী, নিগৃহীত জাতির কর্ম্মবীর, কৈবর্ত্তকুলতিলক, মহাবীর ভীম ও তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ হরির উষ্ণরক্তে বধ্যভূমি প্লাবিত হইল! একদিন পাঞ্চালদুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় জাতিবিশেষের জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক মহাবীর বলিয়াছিলেন,—'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষং'; তারপর বহুযুগ পরে, ঐ কথারই মৌন পুনরুক্তি করিয়া, আভিজাত্যহীন আর এক বীর, বাংলার ইতিহাসের এক কুয়াসাচ্ছন্ন, অখ্যাত অধ্যায়ে, নীরবে পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন!

মহারাজ লক্ষ্মণসেন

সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় যে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

—বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলার চিরনবীন প্রাণের মূর্ত্ত প্রকাশ, বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিভার সমস্ত বিশেষত্বমণ্ডিত, মহাবীর লক্ষ্মণসেনদেব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্যপ্রথার স্রষ্টা মহারাজ বল্লালসেনের পুত্র ও 'চালুক্যকুলেন্দুলেখা' শ্রীমতী রামদেবী তাঁহার মাতা।

লক্ষ্মণসেন বাল্যকালে অন্যান্য বিদ্যার সহিত সামরিক বিদ্যা অতি যত্নের সহিত অভ্যাস করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার ক্ষীণ দেহখানি পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিল, কৈশোরের স্নিগ্ধ লাবণ্যের মধ্য হইতে বীর্য্যদীপ্ত এক যৌবনমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল, ভুজদ্বয় হস্তিশুণ্ডের মত বিশাল এবং বক্ষঃস্থল শিলাখণ্ডের মত কঠিন ও প্রশস্ত হইল। ক্রমে তাঁহার অব্যর্থ শরসন্ধান ও ধনুর্বিদ্যাপারদর্শিতার যশোগানে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। এই তরুণ যৌবনেই তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত বৃহৎ ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের ভীষণতায় শত্রুবক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিত; মৃগয়ায় বাহির হইলে, তাঁহার সাড়া পাওয়া মাত্র মদমত্ত হস্তীগুলি প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিত। কিন্তু, তাঁহার যৌবন-দীপ্তিমণ্ডিত, গর্ব্বোন্নত বীরমূর্ত্তির মধ্যে কলাবিৎ ও ভাবুকের

এমন এক আনন্দোচ্ছল সৌকুমার্য্য ছিল যে, যুবকের ভীম-কান্ত দেহ-সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

যৌবনে লক্ষ্মণসেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পিতামহ বিজয়সেনদেব একবার কলিঙ্গপতি অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ-দেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই অবধি কলিঙ্গ বঙ্গের নিকট নতমস্তক ছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথমেই কলিঙ্গ-রাজ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। জ্বলন্ত পাবকের মত তেজস্বী যুবক, প্রদীপ্ত উৎসাহে, কলিঙ্গ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণসেনের বিক্রমে কলিঙ্গদেশ থরথর কাঁপিয়া উঠিল। কলিঙ্গরাজ পরাজিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কলিঙ্গরমণীগণ অপূর্ব্ব-যৌবনশ্রীমণ্ডিত তরুণ বীরকে প্রীতিপ্রসন্নদৃষ্টি দ্বারা অভিনন্দিত করিল। কলিঙ্গবিজয়ের কিছুদিন পরে, কামরূপরাজ বঙ্গেশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন বহু সৈন্য-সামন্ত সহ বিপুল বিক্রমে কামরূপ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণ কামরূপরাজ সহ্য করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কামরূপাধিপতি অবনতশীর্ষে বঙ্গেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

'বিক্রমবশীকৃতকামরূপ', বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণসেনের হৃদয়ে দেশজয়ের এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তিনি হিন্দুর পুণ্যতীর্থ বারাণসীধাম বাংলার রাজশাসনের অধীনে আনিবার জন্য উত্তরাপথে জয়যাত্রা করিলেন। ভীষণ যুদ্ধে কাশীরাজকে

পরাভূত করিয়া তিনি কাশীধামে বাঙ্গালীর প্রাধান্য স্থাপন করিলেন।

তারপর, লক্ষ্মণসেন রণোল্লাসে মাতিয়া দেশের পর দেশ জয় করিতে লাগিলেন। বঙ্গেশ্বরের সমরজয়স্তম্ভ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমে শ্রীক্ষেত্রে, অসি-বরুণার সঙ্গমস্থলে বারাণসীতে এবং ত্রিবেণীর তীরে প্রয়াগে, যজ্ঞযূপের সহিত একত্র প্রোথিত হইয়া বাংলার জয়গান ও বাঙ্গালীর বাহুবীর্য্যের প্রশংসাবাণী চারিদিকে ঘোষণা করিতে লাগিল।

লক্ষ্মণসেনদেব বহু মূল্যবান গুণে বিভূষিত ছিলেন। বহু শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রাজসভা জয়দেব, হলায়ুধ প্রভৃতি বহু কবি ও পণ্ডিতে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত এবং রাজকার্য্যের অবসরে চিত্তবিনোদনের জন্য, তিনি কবি ও পণ্ডিতদেব সহিত কাব্য ও শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বহুসমরবিজয়ী, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার হৃদয় কাব্য-সরস্বতীর কোমল-পদস্পর্শে সরস ও চিরবসন্তশ্রীমণ্ডিত ছিল। তাঁহার মত রসজ্ঞ, গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী ও হৃদয়বান রাজা খুব কমই বঙ্গের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষের, বীরত্ব ও কাব্যানুরাগের, রাজসভায় অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও সাহিত্যের মধুর আলাপের একত্র সমাবেশ হওয়ায়, তাঁহাকে বঙ্গের বিক্রমাদিত্য আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে।

লক্ষ্মণসেনের যুগ বাংলার এক গৌরবময় যুগ। বাঙ্গালীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এমন অপূর্ব্ব স্ফুরণ আর কোন যুগে

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কাব্যে, কলাবিদ্যায়, সঙ্গীতে, ভাস্কর্য্যে, বাহুবলে, বাঙ্গালী তখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আসীন। বৈষ্ণবকবি জয়দেবের কোমল-কান্ত-পদাবলীর কলগুঞ্জনে সারা-বাংলা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল; ধোয়ীর সুমধুর কলতানে ও গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতীর অপূর্ব্ব পদলালিত্যে গৌড়জন মুগ্ধ হইয়াছিল; সুকবি উমাপতিধরের প্রশস্তিলিপিতে বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি ও বিজয়কাহিনী দেশে দেশে ঘোষিত হইয়াছিল; সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তমের 'ভাষাবৃত্তি', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' ও 'মৎস্যসূক্ত' বাঙ্গালীর বিদ্যাবত্তা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করিয়াছিল; বাঙ্গালী যোদ্ধার বীরত্বে আর্য্যাবর্ত্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলারসিক রাজার উৎসাহে গৌড়ীয় ভাস্করশিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁহার নামানুসারে যে অব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন অংশে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত ছিল এবং এখনও বাংলার বাহিরে কোন কোন স্থানে তাহার প্রচলন দেখা যায়। বাংলার বিগত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিচিহ্ন আজও প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করে। হায়! ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালীজাতি মীন্‌হাজের রূপকথায় ভুলিয়া এই আদর্শ বাঙ্গালী বীরের মস্তকে ভীরুতার কী নিদারুণ কলঙ্ক চাপাইয়া দিয়াছে!

রাজা গণেশ

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণায় রাজা গণেশনারায়ণ ভাহুড়ী নামে একজন প্রবল-প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন। সমৃদ্ধিশালিনী সপ্তদুর্গা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। বাংলায় তখন ইলিয়াশসাহী বংশের আমল। গণেশনারায়ণ কিছুদিন নবাব-সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; পরে, সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া জমীদারীর শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সুশাসন ও উন্নতিকার্য্যে সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলার তদানীন্তন রাজশক্তি বিশেষ প্রবল না হওয়ায়, অনেক পরাক্রান্ত জমীদার নামমাত্র বঙ্গেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছামত নিজ নিজ অধিকৃত দেশ শাসন করিতেছিলেন। গণেশনারায়ণ জমীদারীর ভার গ্রহণ করিয়া দেশের অবস্থা ও রাজশক্তির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিলেন এবং এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশা ও আদর্শকে মনে-মনে পোষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদুর্গার এক জনবিরল প্রান্তে একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। একদিন জমীদারীর কার্য্যে বেড়াইতে বেড়াইতে গণেশনারায়ণ

সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের পদতলে বসিয়া উপাসনায় মন নিবিষ্ট করিলেন। সহসা সেই নির্জ্জন সান্ধ্য-আকাশ মুখরিত করিয়া রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। গণেশনারায়ণ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন—সম্মুখে আলুলায়িতকুন্তলা, স্রস্তবসনা এক নারী ও তাহার পশ্চাতে ভীষণমূর্ত্তি দুইজন পুরুষ! রমণী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া গণেশের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। গণেশনারায়ণকে দেখিয়া পুরুষদ্বয় তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। রমণীর সমস্ত পরিচয় শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে, সে তাঁহারই একজন নিরাশ্রয়া প্রজা এবং তাহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করার অভিপ্রায়ে দস্যুরা তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। গণেশনারায়ণ রমণীকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং আরও অনুসন্ধানে জানিলেন যে, এই দস্যুদ্বয়ই উত্তরবঙ্গের তদানীন্তন বিখ্যাত দস্যু রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ।

কয়েকদিন গণেশনারায়ণ মানসিক অশান্তিতে কাটাইলেন। তিনি ক্রমাগতই ভাবিতে লাগিলেন, এই অসহায়া নারীর লাঞ্ছনার জন্য তিনিই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। তাঁহারই জমীদারী-মধ্যে তিনি যদি দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিতে না পারেন, গৃহী তাহার ধনরত্ন লইয়া, নারী তাহার সম্ভ্রম লইয়া যদি নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে না পারে, তবে কেনই বা তিনি তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন এবং কেনই বা শাসক বলিয়া পরিচয় দেন!

অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন— যেমন করিয়াই হোক, এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদ্বয়কে দমন করিতেই হইবে। তিনি দেওয়ানকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "রামা-শ্যামাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে; আমার জমীদারীর মধ্যে তাহাদের অত্যাচার ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রজাদের ধন-প্রাণ বিপন্ন, আপনি তাহার একটা ব্যবস্থা করুন।" দেওয়ানজী বলিলেন, "রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ বর্ত্তমানে সাঁতোরের রাজা অবনীনাথের অনুগৃহীত। একে ত চলনবিলের স্বত্ব লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের বিবাদ চলিতেছে, তারপর রাম-শ্যামকে শাস্তি দিতে হইলে অবনীনাথের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য।"

গণেশনারায়ণ বলিলেন, "বিপদের ভয়ে যে কর্ত্তব্য অবহেলা করে, সে কাপুরুষ। অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতীকার করিতে হইবে। আপনি আজই অবনীনাথের নিকট রামা-শ্যামাকে অবিলম্বে আমার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত পাঠান। তাঁহার অসম্মতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করিব।"

দেওয়ান নরসিংহের আহ্বানে এক দীর্ঘকায় নমশূদ্র পদাতিক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদকে অবিলম্বে সমর্পণ করিবার জন্য পত্র দিয়া তাহাকে অবনীনাথের নিকট প্রেরণ করা হইল। পত্রে ইহাও লেখা হইল যে, যদি তাহাদের শাস্তিভোগের জন্য শীঘ্র সপ্তদুর্গায় না পাঠান হয়, তবে সাঁতোর রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের ধরিয়া আনা হইবে।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তখনকার উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার। তাহাদের অত্যাচারে অর্দ্ধ-বঙ্গ কম্পিত হইত। রমণীগণ তাহাদের নাম শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, শিশুরা দুরন্তপনা ছাড়িয়া মায়ের বুকে লুকাইয়া চোখ বুজিয়া থাকিত,—তাহাদের অমানুষিক দৌরাত্ম্যের কাহিনীতে লোকের ভয়বিকল হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিত।

অবনীনাথ পত্র পাইয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি পত্রের উত্তর দিলেন—"রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ আমার প্রজা বটে, কিন্তু আপনার অনুরোধে আমি তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নই। তাহারা চোরের মত কোন কার্য্য করে না—বীরের মত লুণ্ঠন করে। আপনার যদি শক্তি থাকে, তবে তাহাদের বাধা দিতে পারেন। অধিকন্তু, চলনবিলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিবার অবাধ অধিকার আমি তাহাদের দিয়াছি, কারণ ঐ সমস্ত স্থান আমার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি।"

গণেশনারায়ণ অবনীনাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহার রাজ্যে এক বিপুল উন্মাদনার স্রোত বহিয়া গেল। চারিদিকে সাজ সাজ রব। পূর্ণ উদ্যমে সৈন্যসংগ্রহ চলিতে লাগিল। লাঠিয়াল, বর্শাধারী, তরবারিধারী প্রভৃতি দলে দলে আসিয়া সপ্তদুর্গায় ভিড় জমাইতে লাগিল। গণেশনারায়ণ ভাবিয়াছিলেন, বাংলার সমস্ত বিচ্ছিন্ন হিন্দুশক্তিকে একত্র করিয়া তিনি গৌড় আক্রমণ করিবেন ও এক স্বাধীন

হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু, বিধাতার কোন এক অজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণে আজ তাঁহাকে এক প্রতিবেশী হিন্দু জমীদারের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইতেছে! ইহার প্রতীকারের আর উপায়ও ত দেখা যায় না। এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদ্বয়ের অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; অবনীনাথ তাহাদের দস্যুবৃত্তি দমন করিবার ভার স্বহস্তেও গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি দস্যুদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, এই সম্পর্কে তিনি ভাদুড়ীবংশের এতদিনের অধিকৃত চলনবিলের অংশবিশেষও কর্ত্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গণেশনারায়ণ, দুষ্টদমনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

সৈন্যসংগ্রহ শেষ হইলে, উপযুক্ত সময়ে, গণেশনারায়ণ প্রবলবিক্রমে সাঁতোর আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। গণেশনারায়ণের সৈন্যগণের শিক্ষা ও তাঁহার যুদ্ধকৌশলের নিকট অবনীনাথের সৈন্যদল শীঘ্রই বিপর্য্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ অবনীনাথের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঘোরতর যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী গণেশের প্রতি প্রসন্না হইলেন। অবনীনাথের কুলপুরোহিত কালীকিশোর আচার্য্যের মধ্যস্থতায় ও অনুরোধে সন্ধি হইল। গৃহবিবাদে নিজেদেরই বলক্ষয় হয় মনে করিয়া গণেশনারায়ণ চিরদিনই এইরূপ যুদ্ধে বীতস্পৃহ

ছিলেন। তাঁহার একমাত্র চিন্তা—কি করিয়া অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিবেন, কি করিয়া গৌড়ের অনুপযুক্ত নবাবকে তাঁহার শক্তি ও বাহুবলের পরিচয় দিবেন। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য অবনীনাথের সাহায্য তাঁহার পক্ষে মহামূল্যবান মনে করিয়া, তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য গণেশনারায়ণ, তাঁহার পুত্র যদুনারায়ণের সহিত অবনীনাথের কন্যার বিবাহ দিলেন। অবনীনাথ ও গণেশনারায়ণ উভয়েই বরবধূকে তাঁহাদের প্রত্যেকের চলনবিলের অংশ যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অবনীনাথের সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিতে লাগিল। উভয়েই পূর্ব্ব মনোমালিন্য বিস্মৃত হইয়া পরম সৌহার্দ্দ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তখন বিলাসপরায়ণ, অত্যাচারী দ্বিতীয় সামসুদ্দিন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আজিমকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আজিম সামসুদ্দিনের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য বহু স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে গণেশের শরণাপন্ন হইলেন। গণেশ দেখিলেন যে আজিম একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও নেতৃত্বাভাবে তাঁহার সংকল্পকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করাইতে পারিতেছেন না। মন্ত্রণাকক্ষের নিভৃত আলোচনার মধ্য হইতে অদূর ভবিষ্যতের একখানি উজ্জ্বল দৃশ্যপট অলক্ষ্যে গণেশনারায়ণের

মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। কে যেন বারবার তাঁহার মনের মাঝে বলিতে লাগিল—এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়, এই সুযোগই তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যোদয়ের প্রথম বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবে। গণেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য বহুদিন হইতে ধীরে ধীরে আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র বঙ্গেশ্বরের বিপক্ষাচরণ করিতে তাঁহার মনে একটা প্রবল দ্বিধা উপস্থিত হইল। অপরিণত সময়ে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া হয়ত তাঁহার সমস্ত আশার সমাধি রচিত হইবে, এই মনে করিয়া তিনি বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। শেষে সেই হৃতরাজ্য, বিপন্ন মুসলমান যুবকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহার অশ্রুসজল, কাতর আবেদন গণেশনারায়ণকে বিচলিত করিল; সর্ব্বোপরি হৃদয়ের নিভৃততল হইতে উত্থিত অভয়বাণী তাঁহার দেহ-মনে নববলের সঞ্চার করিল। গণেশ মনে মনে একবার তাঁহার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি-স্থিতেন য়থা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" তারপর ভাবিলেন,—আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম্ম। ইহাতে আমার স্বার্থ কতখানি ক্ষুণ্ণ হইবে বা আমি কতটুকু বিপদে পড়িব—ইহা চিন্তা করা আমার উচিত নয়। ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা নিহিত আছে, তাহা হইবেই হইবে; শরণাগতকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। গণেশনারায়ণ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আজিমকে আশ্বস্ত করিলেন। কিরূপে, কোন্ দিন গৌড় আক্রমণ করা

হইবে, তাহা স্থির করা হইল ; গণেশ সসৈন্যে কোথায়, কোন্ রাস্তা দিয়া শাহাজাদা আজিমের সহিত মিলিত হইবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল।

আবার বিপুল উদ্যমে গণেশনারায়ণ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সুযোগ্য মন্ত্রী নরসিংহের চেষ্টায় বাংলার বহু স্থান হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া গণেশের পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল। এবার তাঁহার বড় ভরসার স্থল অবনীনাথ ; তাঁহার নিকট, সমস্ত বিবরণ জানাইয়া, সৈন্যসাহায্য চাহিলেন। অবনীনাথ বৈবাহিকের প্রার্থনামত অবিলম্বে রামচাঁদ ও শ্যাম-চাঁদের নেতৃত্বাধীনে বারহাজার সৈন্য পাঠাইলেন। উত্তরবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের বিখ্যাত হিন্দুযোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই গণেশের সৈন্যদলে যোগ দিল। গণেশ সপ্তদুর্গা রক্ষার্থ উপযুক্ত একদল সৈন্য নরসিংহের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, শুভদিনে, শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিয়া ভয়-সংশয়-সঙ্কুল, দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করিলেন।

আজিম শাহ গৌড়ের অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যেদিন গণেশ ও তিনি প্রত্যূষে রাজধানী আক্রমণ করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন—তাহার পূর্ব্বদিন গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন অদ্যই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন এবং প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহাদের শিবির আক্রমণ করিতে পারেন। আজিম প্রমাদ গণিলেন। তিনি গণেশের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন—গণেশের সাহায্য ছাড়া বাদশাহের

বিপুলবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া তাঁহার ত পরাজয়ের নামান্তর মাত্র। আজিম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে অদূরেই গৌড়েশ্বরের সৈন্যগণের কোলাহল শোনা গেল। শত্রুকে অতি নিকটে দেখিয়া আজিম শাহের ধমনীতে ধমনীতে বীর-রক্ত নাচিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন, ভীরুর মত পলায়ন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেওয়াই ভাল। আজিমের মুষ্টিমেয় সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যবশতঃ শীঘ্রই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আজিমও তাহাদের সহিত রণস্থল ত্যাগ করিলেন। সামসুদ্দিন আজিমের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

পরদিন গণেশনারায়ণ যথাসময়ে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, অতর্কিত আক্রমণে আজিম পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং সামসুদ্দিন তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। এতদিন যে আশার বহ্নি তাঁহার হৃদয়ে ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, এই সংবাদ শ্রবণে তাহা প্রবল আকার ধারণ করিল। তিনি ভাবিলেন—গৌড় আক্রমণের এই উপযুক্ত অবসর। তিনি অসীম সাহসে বুক বাঁধিলেন। আজ তাঁহার ভাগ্যপরীক্ষার উপযুক্ত সময়। এই উদ্দেশ্য বিফল হইলে, তাঁহার যে কি পরিণাম হইবে—তাহাও মুহূর্ত্তে তাঁহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। তবুও যাহার জন্য তিনি এতদিন প্রস্তুত হইতেছেন, যে গৌড়-আক্রমণ তাঁহার দিনের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন, যাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি কত

বিনিদ্র রজনী উষ্ণ মস্তিষ্কে শয়নকক্ষে পদচারণা করিয়া কাটাইয়াছেন—সেই আশার সফলতার পক্ষে এমন সুযোগ ছাড়িতে তাঁহার মন কিছুতেই রাজী হইল না। তিনি ভাবিলেন —এই পরাধীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভাল; এই দাসত্বের কঠিন নিগড় বহন করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে চিরকালের মত শয্যাগ্রহণই শ্রেয়। কি কুক্ষণে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ মুসলমানের করে বাংলার সিংহাসন তুলিয়া দিয়াছিলেন, তারপর দুই শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজগণের আর কোন সাড়াই পাওয়া যাইতেছে না। বাংলায় কি হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্য আর উদিত হইবে না? গণেশ-নারায়ণ ভাবিলেন, এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি মনে-মনে তাঁহার ইষ্টদেব নারায়ণের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভু, জানি না কেন আমার প্রাণে স্বাধীনতার এই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার এই তীব্র অনুভূতি জাগাইয়াছ; জানি না, ইহার পরিণাম কি! একদিন তুমি তোমার এক ভক্তের রথে সারথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে চালিত করিয়াছিলে, আমি তোমার ভক্ত হইবার কোন স্পর্দ্ধা রাখি না,—তবে এইটুকু জানি, এ সংসারে তুমিই আমার শেষ আশ্রয়স্থল। আজ এই দুর্ব্বল মানব-বাহিনীর অগ্রভাগে তোমার সেই সুদর্শনধারী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আমি গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলাম;—ফলাফল তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।"

গণেশনারায়ণ একেবারে সৈন্যদের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই-সব, আমি আজই, এই মুহূর্ত্তেই গৌড় আক্রমণ করিবার জন্য গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের বাহু-বলের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। হিন্দু-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য আশা করি, তোমরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিবে। কর্ত্তব্য সম্মুখে রাখিয়া তুচ্ছ আরাম বীরের আকাঙ্ক্ষিত নয়। যদিও আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত, তবুও মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া এখনই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।"

গণেশের উত্তেজনাময়ী বাণী বহুপথপর্য্যটনক্লান্ত সৈনিক-গণের দেহ-মনে বিদ্যুৎ-বেগে নববলের সঞ্চার করিল। তাহারা বিশ্রামের কথা ভুলিয়া গিয়া তখনই গৌড়াভিমুখে রওয়ানা হইতে স্বীকৃত হইল।

গণেশ ভীমবেগে গৌড় আক্রমণ করিলেন। নগর প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল; অধিকাংশ সৈন্য বাদশাহের সহিত আজিমের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। যে সামান্য সৈন্য নগর রক্ষার্থ ছিল, তাহারা প্রাণপণে বাধা দিল; কিন্তু, শীঘ্রই পরাজিত হইয়া কতক বন্দী হইল—কতক নিহত হইল। গণেশ গৌড় অধিকার করিলেন।

গণেশনারায়ণ গৌড় অধিকার করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতি ভীষণ যুদ্ধ আসন্নপ্রায় মনে

করিয়া, তিনি নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। দেহে তাঁহার শত মত্তহস্তীর বল আসিল; প্রাণ এক জ্বলন্ত উৎসাহে পূর্ণ হইল। বিভিন্ন প্রবেশ-পথে সৈন্যগণ দিবারাত্র পাহারা দিতে লাগিল। বাদশাহের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সুকৌশলী গুপ্তচরগণ চারিদিকে প্রেরিত হইল।

কিছুদূর আজিমের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, সামসুদ্দিন এক খণ্ডযুদ্ধে আজিমকে বধ করিলেন। আজিম নিহত হইলে সামসুদ্দিন গৌড়াভিমুখে ফিরিলেন।

গৌড়ের নিকটে আসিয়া সামসুদ্দিন দেখিলেন—এক অভিনব ব্যাপার। রাজা গণেশনারায়ণ রাজধানী অধিকার করিয়াছেন; নগরের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত সুরক্ষিত করা হইয়াছে; স্থানে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করা হইয়াছে;—তাহার মধ্যে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হিন্দুযোদ্ধৃগণ সচকিতভাবে অবস্থান করিতেছে। সামসুদ্দিন এই অসম্ভাবিত বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; পরে ক্রোধে, ক্ষোভে ও নিরাশায় মরিয়া হইয়া গণেশকে আক্রমণ করিলেন। গুপ্তচরের মুখে নবাবের আগমন-সংবাদ শুনিয়া গণেশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন; তিনিও তৎক্ষণাৎ মুসলমানবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন।

হিন্দু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ চলিল। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। গণেশনারায়ণ

অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধের সর্ব্বত্র ছুটিয়া বেড়াইয়া প্রত্যেক সৈন্যকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বহুসময়ব্যাপী যুদ্ধের পর নবাবসৈন্যের পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়া স্বয়ং সামসুদ্দিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি গণেশের সাক্ষাৎ পাইয়া উন্মত্তের মত তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। গণেশ ক্ষিপ্রহস্তে সে আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সিংহবিক্রমে নবাবকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই গণেশের তরবারির ভীষণ আঘাতে সামসুদ্দিনের ছিন্নমুণ্ড মাটিতে পড়িয়া গেল। নবাবের মৃত্যুতে মুসলমান সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। গণেশনারায়ণ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিলেন।

গণেশনারায়ণ বাংলার রাজা হইয়া সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুযোগ্য হিন্দু রাজার রাজত্বে, আবার বাংলার মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল; আবার দেবালয়ে দেবালয়ে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল; আবার গীতা, উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায় জাতির জীবনে ধর্ম্মের জোয়ার আসিল; আবার সংস্কৃতভাষার সুললিত শব্দ কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের উপযুক্ত রাজকার্য্য-পরিচালনে রাজ্যের প্রজাবৃন্দের সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। গণেশনারায়ণের নিরপেক্ষ শাসনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিপুল সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। দেবালয়ের পার্শ্বে মস্‌জিদের উচ্চচূড়া আকাশে শোভা পাইত; মন্দিরের দেবার্চ্চনায় কাঁসরঘণ্টাধ্বনি মস্‌জিদের

উপাসনারত মুসলমানের কর্ণে প্রবেশ করিত; কিন্তু কোথাও কোন বিদ্বেষের ভাব বিন্দুমাত্রও লক্ষিত হইত না। নারী ও শিশুর প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ববিগর্হিত—প্রকৃত হিন্দুবীরের মত এই চিন্তা করিয়া, রাজা গণেশনারায়ণ, মৃত নবাবদিগের পরিবারবর্গের জন্য এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন।

বহুদিন মুসলমানশাসনে অভ্যস্ত হইয়া মুসলমানগণ ভাবিয়াছিল যে, তাহারা ব্যতীত বাংলার মস্‌নদে বসিবার আর কেহই অধিকারী নয়। মুসলমান আমীর ও ওমরাহগণ মনে মনে গণেশের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত এবং তাহাদের অনুগ্রহেই যে গণেশ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সর্ব্বদা এইরূপ ভাব দেখাইত। কিন্তু গণেশ দুর্ব্বলহস্তে রাজ-দণ্ড ধরেন নাই; এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য তিনি কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি অযথাপ্রশ্রয়প্রয়াসী মুসলমান ধর্ম্মযাজক ও ওমরাহদিগকে ঔদ্ধত্যের জন্য কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। ওমরাহগণ পুচ্ছবিমর্দ্দিত সর্পের মত রোষে ফুলিতে ফুলিতে গোপনে গণেশের উপর প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইল। নূর-কুতুবল-আলম নামক এক ফকির তখন মুসলমানসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন এবং বহু মুসলমান তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া অত্যন্ত সম্মান করিত। ওমরাহগণ গণেশের বিরুদ্ধে গোপনে তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্র

আরম্ভ করিল। ফকির, গণেশের মুসলমান-বিদ্বেষ ও অত্যাচারের মিথ্যা কাহিনী জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান করিয়া আনিলেন। ইব্রাহিম বাংলায় আসিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর গণেশনারায়ণ ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তিবিধান করিলেন। সমস্ত আন্দোলন অগ্নিতে জল-সেকের মত মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল।

যখন জৌনপুরের সুলতানের সহিত গণেশনারায়ণের বিবাদ চলিতেছিল, তখন ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে, আরাকানরাজ মেং সুমোয়ান, রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, বাংলায় আসিয়া গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গৌড়েশ্বর গণেশনারায়ণ অবিলম্বে ত্রিশহাজার সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন; সেই বঙ্গবাহিনীর সাহায্যেই আরাকানরাজ হৃতরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বঙ্গেশ্বরের সামন্তরূপে নিজেকে স্বীকার করিলেন।

গণেশনারায়ণের শেষজীবন বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বুকের রক্ত দিয়া গড়া, বড় সাধের হিন্দুরাজত্ব তাঁহার মৃত্যুর পরই বিলীন হইয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন—পুত্র যদুনারায়ণ মৃত নবাবের আশমানতারা নামে এক সুন্দরী কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য যে যদু স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত

আছে এবং রাজসভার মুসলমান ওমরাহগণ যে গোপনে তাহার প্রবল বাসনার অনলে ইন্ধন যোগাইতেছে, একথাও গণেশ-নারায়ণের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কেবল রূপোন্মত্ত যুবক, সিংহের মত পিতাকে ভয় করিয়া, তাহার দুর্দ্দমনীয় কামনার বেগবান অশ্বটিকে কোনমতে ধারণ করিয়া রাখিতে-ছিল। এই দুর্ব্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, বাংলার গৌরব, বাংলার ব্রাহ্মণের গৌরব, গৌড়েশ্বর রাজা গণেশনারায়ণ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুইশত বৎসরের ঘনীভূত-অন্ধকারের পর হিন্দুর স্বাধীনতাসূর্য্য একবার উদিত হইয়াছিল—আবার চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল !

ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলী

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, দ্বাদশভৌমিকগণ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে, ধনজনপূর্ণ, শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রবলপরাক্রান্ত ভৌমিকগণের হৃদয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিল;—তাঁহারা নিজের সুখশান্তি ভুলিয়াছিলেন, রাজ্যের উন্নতি ভুলিয়াছিলেন, জীবনধারণের অত্যাজ্য স্পৃহাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। পরের রাজ্যে রাজার ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে, তাঁহারা হৃদয়ের বিরাট সত্যকার ক্ষুধার কোন তৃপ্তিই খুঁজিয়া পান নাই। পরাধীন জীবনের নিদারুণ পরিহাসে ব্যথিত ও অন্তঃসারহীন, সাধনার নিষ্ফলতার অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া, তাঁহারা সমস্ত অভিনয়ের আয়োজন দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন ও মুক্তির সীমাহীন আকাশে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, একবার পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্রভারতেশ্বর মোগলবাদশাহের শক্তির দিকে একবারও তাঁহারা তাকান নাই;—কিসের এক দুর্দ্দমনীয় প্রেরণায়, তাঁহারা ধনপ্রাণের বিনিময়ে কয়েকদিনের স্বাধীনতাকে মহামূল্যরত্নজ্ঞানে বুকে জড়াইয়া ধরিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

বাংলার এই ভৌমিক-যুগে ঈশা খাঁ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বাংলার রাজনৈতিক আকাশে উদিত হইয়াছিলেন। তিনি

সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করিতেন। খিজিরপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। মুসলমান ভৌমিকদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল ঈশা খাঁকে ভাটিপ্রদেশের অধিপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমগ্র ভাটিপ্রদেশ না হইলেও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বলিয়াছেন যে, ঈশা খাঁ অন্যান্য রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খৃষ্টানদিগের পরমবন্ধু ছিলেন।

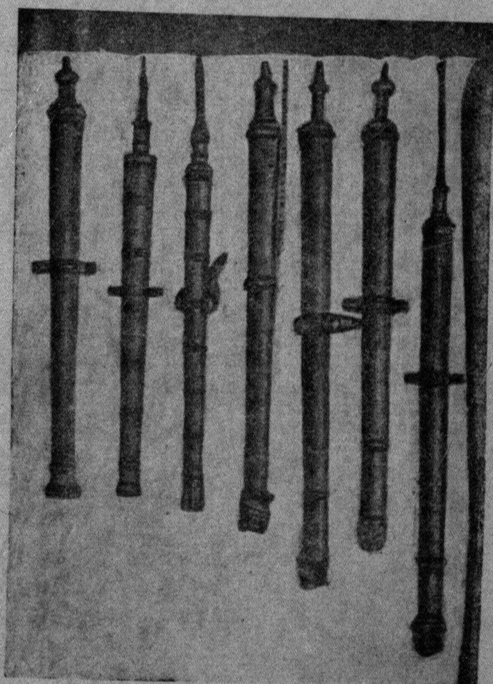
ঈশা খাঁর পিতা কালিদাস গজদানী অযোধ্যাবাসী রাজপুত। হোসেনশাহের রাজত্বকালে বাণিজ্যব্যপদেশে তিনি গৌড়ে আগমন করেন। গৌড়ে আসিয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও এক পাঠান রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্ম্মান্তরগ্রহণের পর কালিদাস সোলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করেন। মুসলমান-পত্নীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে—ঈশা খাঁ ও ইছমাইল খাঁ। পরবর্ত্তী কালে, রাজদরবারের কার্য্যদক্ষতা ও নিজক্ষমতাগুণে এই সোলেমান খাঁ বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়া ভাটিপ্রদেশের কিয়দংশ জায়গীররূপে লাভ করেন। কালক্রমে সোলেমান রাজকর বন্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং শেষে বাদশাহী সৈন্যদলের নিকট পরাস্ত ও নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় ঈশা খাঁ ও ইছমাইল খাঁ শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া তুরাণের এক বণিকের নিকট বিক্রীত হইল। কয়েকবৎসর পরে ইহাদের মাতুল কুতুব খাঁ, বহুচেষ্টা ও যত্নের পর, ভ্রাতৃদ্বয়কে

তুরস্ক হইতে গৌড়ে আনয়ন করেন। ঈশা খাঁ অত্যন্ত সুপুরুষ ও সাহসী ছিলেন; তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক দেহশ্রী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া তদানীন্তন গৌড়াধিপতি দায়ুদ খাঁ তাঁহাকে সৈনিকের পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে নিজক্ষমতাপ্রভাবে ঈশা খাঁ সামান্য সৈনিক হইতে আড়াইহাজারী সেনানায়কের পদে উন্নীত হন। পরে তাঁহার ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত হয় ও অবশেষে তিনি সোনারগাঁয়ে পৈতৃক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমে প্রতিভা-বলে ঈশা খাঁ একজন বিখ্যাত ভৌমিক বলিয়া পরিগণিত হন এবং তাঁহার রাজ্যও অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দায়ুদের মৃত্যুর পর অনেক পাঠানসৈন্য ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁহার শক্তি বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

পাঠান রাজত্বের অবসান হইলেও মোগলরাজশক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারে নাই। বিদ্রোহী পাঠাননেতাদিগকে দমন করিতে বাদশাহ আকবরের বিপুল সৈন্যক্ষয় ও অর্থক্ষয় করিতে হইয়াছে। ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলী বহু পাঠান সেনানায়ককে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন ও পরাজিত পাঠানদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিলেন। বিহার ও উড়িষ্যার কতুলু খাঁ এবং বাংলার ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলী পাঠানবিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে, বিহার-উড়িষ্যায় পাঠানশক্তির একেবারে মূলোচ্ছেদ হইলে, সমস্ত বিদ্রোহী পাঠান বাংলায় আসিয়া ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলীর সহিত যোগদান করে।

প্রথম হইতেই ঈশা খাঁর ইচ্ছা ছিল যে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেইজন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে অনেক দুর্গ নির্ম্মিত হইল, সেগুলি কামান-বন্দুক ও গোলা-গুলিতে পূর্ণ করা হইল। তারপর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তখন মোগলসেনাপতি খাঁ জাহান বহু সৈন্য লইয়া ঈশা খাঁকে দমন করিবার জন্য আসিলেন। ঈশা খাঁ তখনও ভালরূপ প্রস্তুত হইতে পারেন নাই—তিনি মোগলবাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এই সময় তিনি ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা অমরমাণিক্যের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাণী তাঁহাকে নিজের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে মসনদ আলী উপাধি দান করিয়াছিলেন।

খিজিরপুরাধিপতি ঈশা খাঁ পুনরায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া বিতাড়িত পাঠান সেনানায়কদিগকে সোনারগাঁয়ে আশ্রয় দিয়াছেন, এই কথা বাংলার তৎকালীন সুবাদার সাহাবাজ খাঁর কর্ণগোচর হইল। সাহাবাজ, ঈশা খাঁকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য আক্রমণের এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি ঈশা খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"মাসুম কাবুলী সম্রাটের পরম শত্রু। শুনিলাম, সে আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; আপনি তিনদিনের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া আমার হস্তে অর্পণ করুন।" ঈশা খাঁ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি



ঈশা খাঁর কামান

মাসুমের সহিত, কি করিয়া দিল্লীর বাদশাহের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন ও গোপনে এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—আয়োজন শেষ হইলে, উপযুক্ত সময়ে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে করিতেই কয়েক দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিনে বিরাট মোগলবাহিনীর সহিত সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরে উপস্থিত হইলেন। অগণিত মোগলসেনার প্রবল স্রোতে মুষ্টিমেয় পাঠানসৈন্য তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া যাইবে এবং হয়ত তাঁহারা উভয়েই শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া মোগলঘাতকের অসির মুখে প্রাণ হারাইবেন, এই বিবেচনা করিয়া ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলী, ভবিষ্যতে উপযুক্তভাবে মোগলসেনাপতির সম্মুখীন হইবার জন্য, সসৈন্যে রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুর অধিকার করিয়া কত্রাভূ-নগরের অস্ত্রাগার ও মস্যাদিগ্রামের শস্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন।

রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলী ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁর বীর-হৃদয় কিছুমাত্র দমিল না। তিনি ভাবিলেন—বনে বনে, দ্বীপে দ্বীপে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নিরাশ্রয়, বিপন্ন অবস্থায় বেড়াইবেন, তবুও দেহে শেষরক্তবিন্দু পর্য্যন্ত থাকিতে মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের সহিত যে সামান্য রসদ ছিল,

তাহা ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। অনশনক্লিষ্ট পাঠান-সৈন্যদের দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা অদূরস্থিত মৃত্যুর করাল জিহ্বা দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। ঈশা খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অসীম ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া খাদ্যসংগ্রহে বাহির হইলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ঈশা খাঁ প্রচুর খাদ্য ও তৎসঙ্গে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বীপে ফিরিলেন। আবার মৃতপ্রায় পাঠানসৈন্যদের প্রাণে নববলের সঞ্চার হইল। তাহারা বিপুল উদ্যমে মোগলসেনাপতির আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সাহাবাজ খাঁ শুনিলেন যে, ঈশা খাঁ এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতেছে ও অচিরেই মোগল-বাহিনীকে আক্রমণ করিবে। তিনি ঈশাকে আক্রমণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। তারপর ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আজ এখানে, কাল ওখানে,—এইরূপ বহুদিন ধরিয়া খণ্ডযুদ্ধ চলিল। কোনপক্ষই নিশ্চিতরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিল না। মোগলসেনাপতি ঈশা খাঁর বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিলেন না; অবশেষে, ক্ষুণ্ণমনে ব্রহ্মপুত্রনদতীরবর্ত্তী তোটক নামক স্থানে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, ঈশা খাঁর সমস্ত শক্তি চিরকালের মত চূর্ণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তোটকদুর্গে অবস্থানকালে, সাহাবাজ খাঁ শুনিলেন যে,

বজরাপুর নামক স্থানে বহু পাঠানসৈন্য একত্র হইয়াছে ও অতর্কিত আক্রমণে তাহারা মোগলদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। সাহাবাজ খাঁ তৎক্ষণাৎ ঐ সেনাদলকে আক্রমণ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তার্স্তন খাঁ নামক এক সহকারী সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন।

তোটক হইতে বজরাপুর যাইবার দুইটি মাত্র রাস্তা ছিল—একটি ভাওয়ালের মধ্য দিয়া ও অপরটি নদীতীর ধরিয়া। নদীতীরের পথ বিপজ্জনক ও শত্রুপরিপূর্ণ এবং ভাওয়ালের পথ নিরাপদ্ মনে করিয়া, তার্স্তন খাঁ ভাওয়ালের পথে যাত্রা করিলেন। বহুদূর অগ্রসর হইয়া মোগলসেনাপতি বুঝিলেন যে, তাঁহার পথের অনুমান ব্যর্থ হইয়াছে। ভাওয়ালের পথে বহু শত্রুসৈন্য সুযোগের অপেক্ষায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং সুবিধা পাইলেই তাহারা মোগল-সৈন্যের উপর পতিত হইবে। এতদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিবার কোন উপায় নাই দেখিয়া, তিনি আরও সৈন্যসাহায্যের জন্য সাহাবাজ খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কয়েকদিন পরে সংবাদ শুনিলেন যে, যে পথ দিয়া মোগলসৈন্যের আসিবার নির্দ্দেশ ছিল, সেই পথে বহু সৈন্য আসিতেছে। তার্স্তন বুঝিলেন, তাঁহার প্রার্থিত সৈন্যসাহায্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিপদ-মুক্তির আনন্দে অধীর হইয়া, তাহাদিগকে অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য তার্স্তন খাঁ ক্ষুদ্র একদল সৈন্যসহ সেই পথে রওয়ানা হইলেন। নবাগত সৈন্যদলের সম্মুখীন হইতেই তার্স্তন খাঁ

স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—একদল শত্রুসৈন্য পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। পাঠানসৈন্যগণ মোগল-সেনাপতিকে চিনিতে পারিয়াই সিংহবিক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া মোগলশৌর্য্যের গৌরবহানি করিবেন না মনে করিয়া, তার্স্বন খাঁ পাঠানসৈন্যদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অতর্কিত আক্রমণে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া, অনেক মোগলসৈন্য প্রাণভয়ে তার্স্বনকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তবুও, সামান্য কয়েকটি অনুচর লইয়া তার্স্বন প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে একে একে মোগলসৈন্যগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল,—একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে তার্স্বন শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন।

বন্দী মোগলসেনাপতিকে সসম্মানে পাঠানশিবিরে আনিয়া ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলী তাঁহাকে স্বপক্ষে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তার্স্বন তাঁহাদের প্রস্তাব ঘৃণাসহকারে উপেক্ষা করিলেন এবং শেষে উত্তেজিত হইয়া এরূপ তীব্র কটূক্তি করিতে লাগিলেন যে, মাসুম আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে পাঠানঘাতকের তরবারি মুহূর্ত্তে মোগলসেনাপতির শির দ্বিখণ্ডিত করিল।

তার্স্বনের মৃত্যু ও তাঁহার অভিযানের পরিণাম-সংবাদ তোটকদুর্গে পৌঁছিলে, সাহাবাজ খাঁ ক্রোধে অধীর হইয়া, পাঠানবিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য বিরাট মোগল-

বাহিনী সহ দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রের শাখা পনার-নদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোগল-পাঠানে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ঈশা খাঁ স্থানে স্থানে মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তখন বর্ষার প্রারম্ভ। নদীর জল তখনও কূল ছাপাইয়া উঠে নাই। ঈশা খাঁ বহু কৌশলে ব্রহ্মপুত্র হইতে একযোগে পনরটি খাল কাটিয়া দিলেন। বিপুল জলস্রোতে তীরের বন্ধনমুক্ত হইয়া মোগলশিবির প্লাবিত করিয়া দিল। তাঁবু, রসদ, অস্ত্রশস্ত্রাদি, গোলাবারুদ জলের বেগে কোথায় ভাসিয়া গেল। সৈনিকগণের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। এই মহাসুযোগে ঈশা খাঁ প্রবলবেগে সাহাবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। চরম দুরবস্থার মধ্যেও সাহাবাজ খাঁ বিপুল ধৈর্য্যের সহিত আত্মরক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন করিলেন। বিপর্য্যস্ত মোগলসৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সাহাবাজ নদী-তীরে অচিরেই সসৈন্যে সলিলসমাধি লাভ করিবেন এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ ঈশা খাঁর এক প্রধান সেনানায়ক মোগলপক্ষের গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হইল। তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ সেনাপতির আকস্মিক পতনে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ঈশা খাঁ বহুচেষ্টা করিয়াও আর তাহাদের দলবদ্ধ করিতে পারিলেন না। এদিকে অন্যতম মোগলসেনানায়ক, ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেন ভীমবেগে

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঈশা খাঁর বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের নিকট শীঘ্রই পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। সাহাবাজ যুদ্ধে জয়লাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময় ঢাকা হইতে বহু মোগল-রণতরী খাদ্যদ্রব্যাদি সহ উপস্থিত হইল। সাহাবাজ খাঁ কোনমতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

ঈশা খাঁ ভাবিলেন, রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পথে পথে মোগলের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে আর কতদিন চলিবে! যতই দিন যাইতেছে, সৈন্যবল, অর্থবল ততই ক্ষীণ হইতেছে। এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পথ ক্রমেই কঠিন ও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মোগলের সম্মুখীন হইবার আশায় ঈশা খাঁ সাহাবাজ খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বন্দী সৈয়দ হোসেনের মধ্যস্থতায় মোগলে-পাঠানে সন্ধি হইল। সন্ধির সর্ত্তানুসারে, ঈশা খাঁ বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়মিত কর প্রদান করিতে রাজী হইলেন। মাসুম কাবুলীর মনে কিছু দিন হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল,—তিনি বাংলা পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন।

মোগলের সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করিলেও ঈশা খাঁর স্বাধীনতাকামী হৃদয় একটা প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অনন্ত আকাশের বার্ত্তা যাহাদের কাছে পৌঁছিয়াছে, তাহারা আর গৃহকোণে রুদ্ধ হইয়া বিরক্তিকর আরামে পচিয়া

মরিতে পারে না,—মুক্তির এক অনির্দ্দিষ্ট আনন্দই তাহাদিগকে ঘরছাড়া করে ; যাহাদের হৃদয়ে মাতৃযজ্ঞের হোমানল নিশিদিন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে, তাহারা কোন লাভালাভ, কোন সুযোগ-সুবিধারই সাংসারিক হিসাব করিতে বসে না,—প্রাণের অদম্য প্রেরণায় সে আগুনে শুধু আত্মজীবন আহুতি দিয়া ধন্য হইতে চায়। ঈশা খাঁ বেশীদিন মোগলের অধীন থাকিতে পারিলেন না। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ হইল, রাজকর প্রদান বন্ধ হইল,—ঈশা খাঁ মোগলবাদশাহের বিরুদ্ধে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

ঈশা খাঁকে আবার বিদ্রোহী হইতে দেখিয়া সাহাবাজ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ঈশা খাঁও মোগলসুবাদারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। ভাওয়ালের নিকট ভীষণ যুদ্ধ হইল। ঈশা খাঁ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। সাহাবাজ সে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। বহু সম্ভ্রান্ত মোগল আমীর বন্দী হইল। বাদশাহপক্ষীয় অনেক সৈন্য জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সাহাবাজ খাঁ কয়েকটিমাত্র অনুচর সহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আটদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত পথ হাঁটিয়া সেরপুরে উপস্থিত হইলেন। বিজয়ী ঈশা সোনারগাঁয়ে পৌঁছিয়া স্বাধীন নরপতির মত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সাহাবাজের পরাজয়কাহিনী দিল্লীতে পৌঁছিলে, সম্রাট্ আকবর তাঁহার অকর্ম্মণ্যতায় রুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত

করিলেন এবং তাঁহার পদে ওয়াজীর খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। ওয়াজীর খাঁ কয়েকদিনমাত্র বাংলার শাসনভার পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, আকবর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া, বিদ্রোহদমনের জন্য, বিখ্যাত সেনাপতি ও কূটনীতি-বিশারদ মহারাজ মানসিংহকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী পদ প্রদান করিলেন।

পাঠান-দলপতি ওসমান খাঁকে এক ভীষণযুদ্ধে পরাজিত করিয়া, মানসিংহ ঈশা খাঁকে দমন করিবার জন্য বাংলায় উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাঁ তখন স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য চালাইতেছিলেন ও পরাজিত পাঠানদের এক বিশাল শক্তিস্তম্ভ-স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন।

সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইয়া মানসিংহ শুনিলেন যে, ঈশা খাঁ এগারসিন্ধু নামক এক সুদৃঢ় দুর্গে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মোগলসৈন্য এগারসিন্ধু-অভিমুখে ধাবিত হইল। মানসিংহ দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গমূলে মোগল-পাঠানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েকদিন যুদ্ধ হইল, কিন্তু একদিনও ঈশা খাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া গেল না। মানসিংহ মনে করিলেন যে, হয়ত ঈশা প্রাণভয়ে স্বয়ং যুদ্ধে আসেন নাই। মানসিংহের এই অনুমান তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল এবং তাহারা ঈশা খাঁর সৈন্যগণকে এই কথা লইয়া বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কথাটা অবশেষে ঈশা খাঁর কর্ণগোচর হইল। ঈশা খাঁ এক

বিশ্বস্ত দূতের নিকট মানসিংহকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—

"আপনি প্রবলপ্রতাপ মোগলবাদশাহের সেনাপতি। আপনার সৈন্য অগণিত,—অর্থবলও প্রচুর; আর আমি এক ক্ষুদ্র দেশের অধিপতি,—আমার সৈন্যসংখ্যা ও অর্থবল উভয়ই কম। কিন্তু, ব্যক্তিগত বীরত্ব সেনাবলের উপর নির্ভর করে না। সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে যুদ্ধ জয় করা যায় বটে, কিন্তু বীরত্ব, সাহস ও যুদ্ধকৌশল স্বতন্ত্র বস্তু। ঈশা খাঁ ভীরু কি বীর, তাহা আপনি স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি; যদি সাহস থাকে, তবে অগ্রসর হউন। ঈশা খাঁ ভয় কাহাকে বলে জানে না,—কোন কৌশল প্রয়োগের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।"

মানসিংহ পত্র পড়িয়া এইরূপ স্পর্দ্ধিত আহ্বান গ্রহণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। বীরের হৃদয় বীরের আহ্বানে নাচিয়া উঠিল। তিনি ঈশা খাঁর সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, এই মর্ম্মে দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার পত্রের উত্তর দিলেন। এই সংবাদ উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহারা যুদ্ধ-বিরত হইয়া তীব্র উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলের সহিত নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় রহিল। মানসিংহ ভাবিলেন—বাঙ্গালীর দেহে এত শক্তি নাই যে, সে রাজপুতকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করে; তবুও সেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার সম্মুখীন হইতে এক

অজানিত ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ঈশা খাঁর শারীরিক বল ও যুদ্ধকৌশল পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমেই স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া, তাঁহার জামাতা দুর্জ্জনসিংহকে পাঠাইলেন ; কিন্তু, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অপরপক্ষকে জ্ঞাপন করিলেন না। ঈশা খাঁ মানসিংহকে পূর্ব্বে কখনও ভালরূপ দেখেন নাই,—জামাতাকেই মানসিংহ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে মুখোমুখী দণ্ডায়মান রহিল। বহুস্থান হইতে দর্শকবৃন্দ এই অভাবনীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিবার জন্য এগারসিন্ধুদুর্গমূলে সমবেত হইল। উভয়পক্ষের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে বিশালকায় রাজপুত ও কমনীয়দেহ বাঙ্গালী, রণবাদ্যের তালে তালে অসি সঞ্চালন করিয়া পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। ঈশা খাঁর অপূর্ব্ব অসিচালনা-কৌশলে দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বহুচেষ্টা করিয়াও দুর্জ্জনসিংহ ঈশা খাঁর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ঈশা খাঁর তরবারির আঘাতে দুর্জ্জনসিংহের ছিন্ন মুণ্ড রণক্ষেত্রের ধূলি চুম্বন করিল। মানসিংহ তাঁহার সেনাদলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্জ্জনসিংহ নিহত হইল দেখিয়া, তিনি শোকে, দুঃখে ও ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া একলাফে ঈশা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও সগর্ব্বে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরদ্বয়ের ভীষণ পদভরে সমরভূমি কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। উভয়ের তরবারির সংঘর্ষে, চপলার চকিত চমকের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দর্শকগণের চক্ষুর উপর এক একবার খেলিয়া যাইতে লাগিল। যোদ্ধৃদ্বয়ের সাময়িক জয়-পরাজয়ে উভয়দলের সৈন্যদের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে হর্ষ ও বিষাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত দেখিয়া, ঈশা খাঁ হুঙ্কারধ্বনিতে দর্শকমণ্ডলীকে চমকিত করিয়া সিংহবিক্রমে মানসিংহের উপর পতিত হইলেন। মানসিংহ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না ;—বহুকৌশলে নিজের প্রাণরক্ষা করিলেও, তাঁহার তরবারি ঈশা খাঁর তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। প্রবীণ সেনাপতি লজ্জায়, ক্ষোভে ও অপমানে মস্তক অবনত করিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ঈশা খাঁর সৈন্যগণ জয়োল্লাসধ্বনিতে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। ঈশা খাঁ মানসিংহকে বলিলেন, "আপনার যুদ্ধসাধ মিটিয়াছে ত? যদি ইচ্ছা করেন, তবে মল্লযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন। এই আমি অস্ত্রত্যাগ করিতেছি,—আসুন!" মানসিংহ নির্ব্বাক্—অধোমুখ। মানসিংহের নিস্তব্ধতায় ঈশা খাঁ তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে অনিচ্ছুক মনে করিয়া, নিজহস্তস্থিত তরবারি মানসিংহের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "এই নিন্ আমার তরবারি, আমি অন্য তরবারি আনাইয়া লইতেছি। ঈশা খাঁ নিরস্ত্র যোদ্ধার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে না,—পুনরায় যুদ্ধ করা যাক্।"

মৃত্যুর পরিবর্ত্তে শত্রুর নিকট এই অযাচিত প্রাণদান পাইয়া, মানসিংহ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ঈশা খাঁর বক্ষের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার বন্ধুত্ব কামনা করিলেন। ঈশা খাঁও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যালিঙ্গন করিলেন। উভয়পক্ষের সৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। ঈশা খাঁর বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া মানসিংহ তাঁহাকে দিল্লীতে সম্রাট্ আকবরের দরবারে লইয়া গেলেন। আকবর তাঁহার মহৎ ব্যবহারে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাইশটি পরগণার শাসনভার অর্পণ করিলেন। ঈশা খাঁও সম্রাটের সৌজন্যে আপ্যায়িত হইয়া, আর কোনদিন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তারপর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ঈশা খাঁ নামমাত্র সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার একজন মিত্ররাজরূপে সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৯৯—১৬০০ খৃষ্টাব্দে, সোনারগাঁয়ের গৌরবরবি, বাংলার এই মুসলমান বীর ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

চাঁদরায় ও কেদার রায়

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন মোগলকুলগৌরব সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন দ্বাদশসূর্য্যের মত দ্বাদশভৌমিক বাংলার রাজনৈতিক আকাশে উদিত হইয়াছিলেন। বারভূঞাদের যুগে বাংলার সামরিক শক্তির এক অভাবনীয় বিকাশ হইয়াছিল, বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্বাধীনতার এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল এবং নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের মত বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত ক্ষাত্রশক্তি একবার প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে দেখিতে গেলে বারভূঞাগণ বঙ্গেশ্বরের অধীন, কিন্তু বাহুবলে তাঁহারা স্বাধীন নরপতির মত রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা কাহাকেও কর দিতেন না বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। অসংখ্য সৈন্য ও রণতরী লইয়া তাঁহারা সদর্পে নিজ নিজ অধিকৃত দেশ শাসন করিতেন।

বাংলার এই গৌরবময় যুগে বারভূঞাদের অন্যতম চাঁদরায় ও কেদার রায় বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। শ্রীপুর সোনারগাঁ হইতে নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। আজ রায়রাজগণের সেই প্রিয়তমা রাজধানী

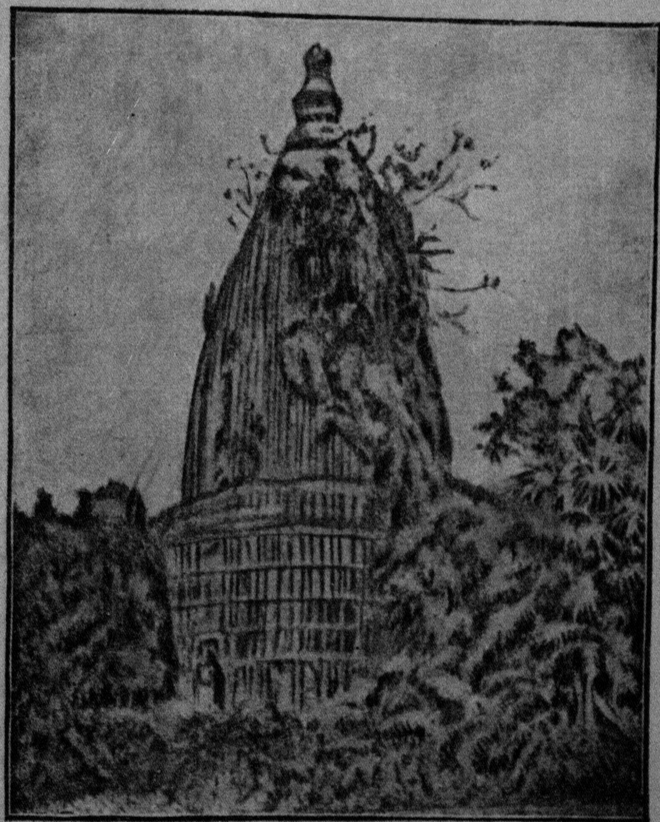
শ্রীপুরের চিহ্নমাত্রও নাই! কালীগঙ্গা নামে অধুনা-বিলুপ্ত এক নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনীর তীরে শ্রীপুর একদিন প্রদীপ্ত-মণিখণ্ডবৎ বিরাজ করিয়া সমস্ত বিক্রমপুর আলোকিত করিয়াছিল। একদিন শ্রীপুরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা বাংলার নানাপ্রান্তে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালী শিল্পীর বহুসাধনার ধন, অপূর্ব্বকারুকার্য্যখচিত শ্রীপুরের বিশাল রাজ-প্রাসাদ একদিন দর্শকের নিকট ইন্দ্রপুরীর ন্যায় বোধ হইত। সুপ্রশস্ত রাজপথের উভয়পার্শ্বে অগণিত সৌধমালা উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিত। রাজপথপার্শ্বের তরুশ্রেণী সুশীতল ছায়ায় শ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি দূর করিত। নানাদ্রব্যপূর্ণ শত শত দোকানে দিবারাত্র ক্রেতার ভিড় লাগিয়া থাকিত। কাচস্বচ্ছ-জলপূর্ণ বৃহৎ সরোবর সর্ব্বদাই জনসমাগমে কলকোলাহলপূর্ণ থাকিত; কখনও বা স্নানার্থিনী নগরবাসিনীদের বলয়শিঞ্জনের মৃদুমধুর ধ্বনি বাতাসে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইত। নগরের স্থানে স্থানে, উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত সেনানিবাস ছিল। তাহাদের সম্মুখস্থিত শ্যামলশষ্পাস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রতিদিন অপরাহ্নে বাঙ্গালী সৈনিক সামরিক শিক্ষালাভ করিত ও কৃত্রিম রণাভিনয়ে মত্ত থাকিত। শ্রীপুরবন্দরে, বহুদেশাগত মগ, পর্ত্তুগীজ ও মুসলমানের নানাবাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ, ভাসমান প্রাসাদের মত নৌকাশ্রেণী শোভা পাইত ও তাহাদের বহুবর্ণরঞ্জিত পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া আকাশে ইন্দ্রধনুর ভ্রম জন্মাইত। কালীগঙ্গার মোহনায়, বৃহৎ কামানপূর্ণ অসংখ্য রণতরী সগর্ব্বে

বিরাজ করিত। রাজধানীর মধ্যে কোথাও বা নগররক্ষি-পরিবেষ্টিত বিচারালয়, কোথাও বা সৈনিকপরিরক্ষিত কারাগার ছিল। কোটীশ্বরপল্লীর ভক্তিনম্রসৌন্দর্য্য ও অতুল বিভব তৎকালের বিদেশী পর্য্যটকদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত। কোটীশ্বর শিবলিঙ্গের বেদীমূলে এক কোটী টাকা প্রোথিত করিয়া ঐ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। কোটীশ্বরের মন্দিরের গগনচুম্বী চূড়া বহুদূর হইতে আকাশপটে চিত্রিত বলিয়া বোধ হইত। ঐ পল্লীতে নগরের সমস্ত দেবালয়গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বর্ণনির্ম্মিত দুর্গামূর্ত্তি, স্বর্ণচূড় এক বৃহৎমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগরবাসিগণ তাহাকে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। দুর্গা-মন্দিরের অদূরেই দশমহাবিদ্যার বিশাল মন্দির উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান ছিল। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সদ্যস্নাত, চন্দন-চর্চ্চিত, গৌরবর্ণ পূজারিদিগের স্তবপাঠধ্বনিতে কোটীশ্বর-পল্লীবাসীদের প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হইত। প্রতিদিন দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যায়, দেবার্চ্চনার কাঁসরঘণ্টাধ্বনি নগরবাসীদের প্রাণে এক স্বর্গীয় আনন্দের সৃষ্টি করিত। আজ সেই স্বাধীনতার পুণ্যতীর্থ, আত্মোৎসর্গের লীলাক্ষেত্র, বিক্রমপুরের গৌরবভূমি শ্রীপুর, রাক্ষসী পদ্মা গ্রাস করিয়াছে।

চাঁদরায় ও কেদার রায়ের দেশবিশ্রুতকীর্ত্তি নাশ করিয়া পদ্মা এখানে 'কীর্ত্তিনাশা' অপনাম অর্জ্জন করিয়াছে। আজ শ্রীপুর নাই, চাঁদ-কেদারের কীর্ত্তির শেষ চিহ্ন, তাঁহাদের মাতার

শ্মশানোপরি নির্ম্মিত রাজাবাড়ীর মঠটিও কয়েক বৎসর হইল ধ্বংসলীলাময়ী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত নশ্বর কীর্ত্তির অতীত, সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যের বাহিরে, দেশপ্রেমের যূপকাষ্ঠে রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মবলিদানের যে অমর কীর্ত্তি অশরীরিণী মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে অশ্রুকণার সহিত এই তিনশত বৎসরাধিক পূজিত হইয়া আসিতেছে—কোন কাল তাহা ধ্বংস করিতে পারিবে না, কোন বেগবতী নদী সে কীর্ত্তি নাশ করিতে পারিবে না। সে ত্যাগ-বীরত্ব-মহিমোজ্জ্বল, মৃত্যুহীন স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে,—তাহার দুর্ব্বল বাহুতে বল দিবে, অবসন্ন হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিবে।

চাঁদরায় ও কেদার রায় যখন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা একটা সন্ধি-যুগে উপস্থিত হইয়াছে। দায়ুদের ছিন্নমুণ্ডের উপর মোগলের প্রতিষ্ঠাসৌধ তখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে রচিত হয় নাই। বাংলার পাঠানগণ কতক উড়িষ্যায়, কতক ভাটিরাজ্যে, কতক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। বারভূঞাগণ তখন প্রায় স্বাধীন-ভাবেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বাংলার নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছেন। চারিদিকে তখন বিদ্রোহের বাতাস বহিতেছে। মোগল-পাঠানে, মোগলে-ভূঞায় তখন মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতেছে। মোগলশক্তি তখন ক্রমাগত বিদ্রোহদমনে ব্যতিব্যস্ত। এদিকে



রাজাবাড়ীর মঠ

মগ ও পর্ত্তুগীজজলদস্যুদের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ ও নিম্ন-বঙ্গের (ভাটি) অধিবাসিগণ ধনপ্রাণ লইয়া সর্ব্বদা শশব্যস্ত। এই বিপ্লবযুগে রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাণে স্বাধীনতালাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। কনিষ্ঠ কেদার রায়, অসাধারণ রণ-পণ্ডিত, রাজনীতি-বিশারদ, সুদক্ষ শাসক ও মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন। মোগলের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিয়া, বিক্রমপুরে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি বাদশাহের তুলনায় সামান্য একজন জমীদার মাত্র,—একা বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরিণামে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন না মনে করিয়া, তিনি সমস্ত ভৌমিকরাজ-গণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফলও হইল; অধিকাংশ ভৌমিকগণ জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য একযোগে কাজ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য—এ প্রতিজ্ঞা কেবল প্রতিজ্ঞামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া রহিল। ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা ও প্রাধান্যলাভাকাঙ্ক্ষায় অনেক ভৌমিকরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করিতে যাইয়া, বৃহত্তর স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণঘাতী আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঈশা খাঁ তখন সোনারগাঁয়ের প্রবলপ্রতাপশালী অধিপতি; খিজিরপুর তাঁহার রাজধানী। বাংলার দ্বাদশভৌমিকের তিনি অন্যতম ছিলেন। দায়ুদের পতনের পর, অনেক পাঠান তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কয়েকবার মোগলের সহিত সংঘর্ষ

হওয়ার পর, তিনি বিপুল বলসংগ্রহ করিয়া মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ঈশা খাঁর সহিত চাঁদরায় ও কেদার রায়ের অগাধ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের পরস্পরের উদ্দেশ্য এক হওয়ায় প্রীতির বন্ধন খুবই দৃঢ় হইয়াছিল।

যখন এইরূপে বঙ্গের ভৌমিকরাজগণের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন একদিন, বিশেষ পরামর্শ ও আলোচনার জন্য ঈশা খাঁ শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। রায়ভ্রাতৃদ্বয় পরমসমাদরে সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশা খাঁর আগমনে সমস্ত শ্রীপুর আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল। নগরের স্থানে স্থানে দিবারাত্র নৃত্যগীত চলিতে লাগিল। চাঁদরায় ও কেদার রায়, খাঁ সাহেবকে লইয়া নগরের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীপুরের বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈশা খাঁ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এইরূপে কয়েকদিন আহ্লাদের বন্যার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। ফিরিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে, ঈশা খাঁ বলিলেন, "ভাই, আপনাদের আশাতিরিক্ত আদর-আপ্যায়নে ত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি,—এখন যে প্রয়োজনে আমার আসা, সে বিষয়ের একটা বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।"

রাজনৈতিক মন্ত্রণা অত্যন্ত গোপনে হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, চাঁদরায় ও কেদার রায়, রাজপ্রাসাদের এক নিভৃতকক্ষে তাঁহার বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বহুক্ষণ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও তাঁহাদের করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিবেন, এমন সময় চাঁদরায়ের বিধবা ভগ্নী স্বর্ণমণি ঘরে প্রবেশ করিল। স্বর্ণ অপূর্ব্বসুন্দরী। স্বর্ণমণি কোন গৃহকার্য্যের উদ্দেশ্যে ঘরে আসিয়া, ভ্রাতৃদ্বয় ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ঈশা খাঁর চোখের সাম্‌নে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাঁহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। তিনি টলিতে টলিতে রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত কোন মতে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন।

সোনারগাঁয়ে পৌঁছিয়া ঈশা খাঁ মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি পাইলেন না। সমস্ত রাজকার্য্য তিক্ত হইয়া উঠিল। যে রূপের আগুন তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তিলে তিলে তাহা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল—স্বর্ণমণির অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে, যে-কোনও উপায়ে স্বর্ণকে লাভ করিবার জন্য ঈশা খাঁর হৃদয়ে একটা অতি প্রবল বাসনার জ্বালাময়ী নাগিনী গর্জ্জিয়া উঠিল। তিনি একবার মনস্থ করিলেন—শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া স্বর্ণমণিকে হরণ করিয়া লইয়া আসেন; কিন্তু দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহসে একেবারেই কুলাইল না। আবার ভাবিলেন—রায়পরিবারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া, স্বর্ণমণিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাঁহার মত যোগ্যপাত্রে ভগ্নীকে সমর্পণ

করিতে চাঁদরায় ও কেদার রায় কখনই আপত্তি করিবেন না। বহুচিন্তার পর, ঈশা খাঁ স্বর্ণমণিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীপুরে চাঁদরায়ের নিকট এক বিশ্বস্ত দূত পাঠাইলেন। মোহান্ধ পাঠান নরপতি একবারও ভাবিলেন না যে, একজন প্রবলপরাক্রান্ত, স্বাধীন হিন্দুরাজার নিকট তাঁহার বিধবা ভগ্নীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করা কী অমার্জ্জনীয় অপরাধ!

আহারান্তে রায়ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় পাঠান-দূত ঈশা খাঁর পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। পত্র পড়িয়া চাঁদরায় কিছুক্ষণ পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। বিজাতীয় ক্রোধে ও ঘৃণায় তাঁহার মুখে বাক্য সরিল না। কেদার রায় জ্যেষ্ঠের হাত হইতে পত্রখানা লইলেন ও তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় লাফ দিয়া উঠিলেন। আহত ব্যাঘ্রের মত, তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষুদুইটি হইতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় তিনি দূতকে বলিলেন, "তোমার শাস্তি নিষিদ্ধ, তাই তোমাকে কিছু বলিলাম না। তোমার প্রভুকে বলিও, অসির ফলকে ও কামানের মুখে শীঘ্রই এ পত্রের উত্তর দিব।" চাঁদরায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এই খলকে এতদিন পরমবন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছি, একথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। এইবার এই দুর্জ্জনের সমুচিত শাস্তিবিধান করিতে হইবে।" তখনই সেনাপতি রঘুনন্দন রায়কে সংবাদ দেওয়া হইল; রঘুনন্দন উপস্থিত হইলে কেদার রায় বলিলেন, "আমরা আগামী কল্যই ঈশা খাঁর

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব; আপনি সৈন্য সজ্জিত করুন—সোনারগাঁ এবার শ্মশান না করিয়া ফিরিব না।”

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সংবাদ নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কয়েক দিন পূর্ব্বে, যাহার আগমনে নগরবাসিগণ আনন্দস্রোতে ভাসিয়াছিল, আজ তাহার নাম শুনিয়া তাহারা নাসিকাকুঞ্চন করিতে লাগিল। রাজবংশের এই অবমাননায় রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। বিপুল উদ্যমে যুদ্ধায়োজন হইতে লাগিল। অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌসৈন্য দলে দলে সজ্জিত হইতে লাগিল। রণতরীর উপর বিবিধ বর্ণের পতাকা উড়িতে লাগিল। মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ও সহকারী সেনানায়ক রামরাজা সর্দ্দার প্রভৃতির উপর নগররক্ষার ভার দিয়া, ইষ্ট দেবী ছিন্নমস্তার নাম স্মরণ করিয়া, চাঁদরায় ও কেদার রায় ঈশা খাঁর ঘৃণিত প্রস্তাবের সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ঈশা খাঁ কলাগাছিয়া দুর্গে অবস্থান করিতেছেন, দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া কেদার রায় ভীমতেজে কলাগাছিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। হিন্দু-পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেদার রায় কলাগাছিয়া দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া জয় জয় নাদে ত্রিবেণীর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। শ্রীপুররাজের কামানশ্রেণী বজ্রগর্জ্জনে অনলবর্ষণ করিতে লাগিল। উত্তেজিত হিন্দুসেনার প্রবল আক্রমণ ঈশা খাঁ সহ্য করিতে না পারিয়া,

তাঁহার রাজধানী খিজিরপুরে পলায়ন করিলেন। রণোন্মত্ত রায়ভ্রাতৃদ্বয় ত্রিবেণীর দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া খিজিরপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। খিজিরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহারা খিজিরপুর অবরোধ করিলেন।

শ্রীমন্ত খাঁ নামে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের একজন কর্ম্মচারী ছিল। সে রাজকার্য্যনিপুণ ও রাজপরিবারের অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু, একটা সামাজিক ব্যাপার লইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত তাহার ঘোরতর মনোমালিন্য ঘটে। শ্রীমন্ত খাঁর সামাজিক পদমর্য্যাদা অত্যন্ত বেশী ছিল, কিন্তু চাঁদরায় তাহা উপেক্ষা করিয়া কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান করেন; শ্রীমন্ত ইহাতে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু চাঁদরায় পূজারি ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ, আচারপূত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার কার্য্য সমর্থন করেন। শ্রীমন্ত তবুও একার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু শেষে রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের রোষকষায়িত চক্ষুর সাম্‌নে ভয়ে নিরস্ত হয় এবং দেবল ব্রাহ্মণকেই গোষ্ঠীপতি বলিয়া মানিতে বাধ্য হয়। এইরূপে অপমানিত হইয়া শ্রীমন্ত ক্রোধে, ক্ষোভে ও লজ্জায় চাঁদরায় ও কেদার রায়ের প্রতি দারুণ প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। মনে-মনে রায়রাজগণের নিরন্তর সর্ব্বনাশ কামনা করিলেও, চতুর শ্রীমন্ত বাহ্যিক ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও তাহা কাহাকে জানিতে দেয় নাই, বরং অধিকতর বন্ধুত্বের ভান করিয়াই চলিয়াছে।

শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল এবং খিজিরপুরে তাঁহাদের শিবিরে অবস্থান করিতেছিল। সেখানে একদিন উপযুক্ত অবসরে সে গোপনে ঈশা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং যে-কোনও প্রকারেই হোক্ স্বর্ণমণিকে তাঁহার করে সমর্পণ করিবে বলিয়া প্রস্তাব করিল। খাঁ সাহেব আনন্দে অধীর হইয়া, এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অগ্রিম কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া, শ্রীমন্ত স্বর্ণমণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য শ্রীপুর-অভিমুখে যাত্রা করিল।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে শ্রীমন্ত শ্রীপুরের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইল। কেশপাশ তাহার উচ্ছৃঙ্খল, পদদ্বয় নগ্ন, চক্ষু ক্রন্দনে আরক্ত। একেবারে ছুটিয়া সে অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া সংবাদ দিল, চাঁদরায় ও কেদার রায় ঈশা খাঁর হস্তে বন্দী হইয়াছেন ও ঈশা খাঁ শ্রীপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছে ; শ্রীপুর ধ্বংস করিয়া সে স্বর্ণমণিকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে। রাজপুরী আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই নিদারুণ সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে নগর-মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র চারিদিকে বিরাট হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রন্দনের রোলে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। রাণী এই বিপদে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, সহকারী সেনাপতি রামরাজা সর্দ্দার প্রভৃতিকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত পূর্ব্ব হইতেই রায়রাজ-

গণের বিশ্বাসভাজন থাকায় অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত। শ্রীমন্ত সেই পরামর্শসভায় উপস্থিত রহিল। রাণী বলিলেন, "স্বর্ণমণিকে লইয়া আমরা কোথাও এক নিরাপদ্ স্থানে চলিয়া যাই। স্বর্ণ এখানে নাই শুনিলে, ঈশা খাঁ রাজধানী আক্রমণ না করিয়া ফিরিয়াও যাইতে পারে।" ধূর্ত্ত শ্রীমন্ত তৎক্ষণাৎ একথায় সায় দিয়া বলিল, "রাণী-মার একথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত; আমার বিবেচনায় আর কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই, স্বর্ণকে স্থানান্তরিত করিলেই হইবে। স্বর্ণকে চন্দ্রদ্বীপে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠানই সবচেয়ে নিরাপদ্।"

মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এ সংবাদ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না; গতপরশ্ব আমি যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াছি। এখন মাত্র মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের সৈন্যগণ শিবিরসন্নিবেশ করিয়া খিজির-পুর অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে। তারপর, মহারাজ ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই কৌশলী যোদ্ধা;—হঠাৎ এরূপ দুর্ঘটনা কিরূপে ঘটিল, তাহা ত বুঝিতে পারি না।"

রাণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কী বলিতেছেন! খাঁ মহাশয় কি মিথ্যা কথা বলিলেন? কখন কিরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা কি বলা যায়! তাঁহার কথাই সমীচীন। আপনি অদ্যই স্বর্ণকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়া নগররক্ষার ব্যবস্থা করুন;—তারপর আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।"

প্রবীণ মন্ত্রী বার বার রাণীকে অন্যরূপ বুঝাইতে লাগিলেন,

কিন্তু রাণী, স্বর্ণমণির রক্ষার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া, অন্য কোন যুক্তিই কানে তুলিলেন না। শেষে রঘুনন্দন বলিলেন, “আমি অদ্যই খিজিরপুরে দূত পাঠাইতেছি, সমস্ত সংবাদ জানিয়া স্বর্ণমণিকে অন্যত্র পাঠাইবার ও নগররক্ষার বন্দোবস্ত করিব।”

শ্রীমন্ত খাঁ কপালের ঘাম-বিন্দুগুলি মুছিয়া বলিলেন, “মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন? এরূপ মিথ্যাকথা বলায় আমার কি স্বার্থ? আর যদি আমার কথা মিথ্যাই প্রমাণিত হয়, তখন স্বর্ণকে আবার তাহার পতিগৃহ হইতে আনিলেই হইবে। আপনি নগররক্ষার বন্দোবস্ত করুন, আমিই স্বর্ণকে লইয়া নিরাপদে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।”

মন্ত্রী এবারেও প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু শেষে রাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অগত্যা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্ত খাঁর সহিত রাজ-ভগ্নীকে শ্বশুরালয়ে পাঠানই স্থির হইল। ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া স্বর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিল। ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনে যেদিন সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া স্বর্ণ পিত্রালয়ে পদার্পণ করিয়াছিল, সেদিন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূদ্বয় তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন;—তারপর এই কয় বৎসর, তাঁহাদের অপর্য্যাপ্ত আদরে, সোহাগে, যত্নে, তাহার ক্ষতহৃদয় শান্তির প্রলেপে জুড়াইয়া গিয়াছে। আজ সেই সুখনীড়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পিতৃপরিবারকে

এক আসন্ন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া, আবার সেই স্মৃতির শ্মশান-ভূমিতে পদার্পণ করিতে তাহার হৃদয় অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন পরে, পতিপুত্রহীনা, ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা, অভাগিনী ননন্দাকে বিপন্ন অবস্থায়, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিদায় দিতে সমবেদনাময়ী ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের চক্ষুতেও অশ্রুর বন্যা ছুটিল। তাঁহারা কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া স্বর্ণকে বিদায় দিলেন। সয়তান শ্রীমন্ত খাঁ নৌকায় উপবেশন করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল ও নিজের অপূর্ব্ব অভিনয়ের কৃতকার্য্যতায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল।

নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত প্রচুর উৎকোচ দিয়া মাঝি-মাল্লাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নৌকা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে সোনারগাঁ-অভিমুখে চলিতে লাগিল। নৌকায় বসিয়া স্বর্ণ ভাবিতে লাগিল—তাহার জন্যই আজ তাহার ভ্রাতৃদ্বয় শত্রুহস্তে বন্দী, তাহার জন্যই শ্রীপুর শ্মশান হইতে চলিল। পোড়া রূপই তাহার নিদারুণ অভিসম্পাত হইয়াছিল! ভাবিতে ভাবিতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নৌকা এক নির্জ্জন, তীরতরুছায়াচ্ছন্ন ঘাটে আসিয়া ভিঁড়িল। পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত বাহকগণ এক শিবিকা নৌকার নিকট উপস্থিত করিল। শ্রীমন্ত স্বর্ণকে নামাইয়া পাল্কীতে উঠাইয়া দিল। বাহকগণ স্বর্ণমণিকে লইয়া নানা গুপ্তপথ দিয়া, খিজিরপুরে ঈশা খাঁর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল।

এদিকে মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী সেই দিনই খিজিরপুরে একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠাইলেন। দূত শ্রীপুররাজের শিবিরে যাইয়া চাঁদরায়ের হস্তে পত্র প্রদান করিল। চাঁদরায়ের মস্তকে যেন ভীমগর্জ্জনে শতবজ্র একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পত্র পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। কেদার রায় ছুটিয়া আসিয়া পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। চাঁদরায় বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত তাহার প্রতিহিংসা পূর্ণ করিল ; নিশ্চয়ই শ্রীমন্ত চক্রান্ত করিয়া স্বর্ণকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে ; চন্দ্রদ্বীপে যাওয়া তাহার ছলমাত্র। হায়! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইল! স্বর্ণকে বুঝি আর পাওয়া যাইবে না! হা কোটীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল!" কেদার রায় বলিলেন, "আজীবন আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া এই নরপিশাচ ব্রাহ্মণ শেষে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল! আপনি আজই রাজধানীতে যাইয়া চারিদিকে দূত ও গুপ্তচর পাঠান ;—শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশা খাঁকে না লইয়া আমি শ্রীপুরে ফিরিব না।"

চাঁদরায় শ্রীপুরে আসিয়া নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন। চন্দ্রদ্বীপ হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল স্বর্ণমণি সেখানে যায় নাই। কয়েকদিন পরে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল, শ্রীমন্ত খাঁ ঈশা খাঁর রাজধানীতে অবস্থান করিতেছে ও স্বর্ণমণি ঈশা খাঁর অন্তঃপুরে বন্দিনী। নিরতিশয় লজ্জায়, অপমানে ও মনঃকষ্টে মথিত হইয়া চাঁদরায় লোকসংস্রব ত্যাগ

করিলেন। রাণী, অমাত্য, বন্ধু-বান্ধব—কাহারও সহিত তিনি আর বাক্যালাপ করিলেন না। সমস্ত পৃথিবী তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোটীশ্বরের মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইলেন ও অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় বিগ্রহের পাদমূলে পড়িয়া রহিলেন। পাত্র-মিত্র ও নগরের বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসী শতচেষ্টা করিয়াও তাঁহার অনশন-ব্রত ভাঙ্গিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। তিনি কোটীশ্বরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, "হে কোটীশ্বর, এতকাল তোমার সেবা করিয়া কি এই ফল পাইলাম! আমার পবিত্র কুলে কলঙ্ক স্পর্শ করিল! আমার ভগিনী মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইল! যদি এতই করিলে ঠাকুর, তবে আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, আমি আর লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না।" তিন দিবস, তিন রাত্রি, এইভাবেই অতিবাহিত হইল। চতুর্থদিন রাত্রের শেষ-প্রহরে চাঁদরায় স্বপ্ন দেখিলেন—কোটীশ্বর স্নিগ্ধকরপল্লবের দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "বৎস, যাহা বিধিনিয়ন্ত্রিত তাহা ভোগ করিতেই হইবে। স্বর্ণের জন্য আর বৃথা দুঃখ করিও না, তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। অদূর-ভবিষ্যতে তোমাদের বংশের উপর যে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।"

পরদিন প্রভাতে চাঁদরায় মন্দির হইতে বাহির হইয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন ও শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া

শয্যাগ্রহণ করিলেন। সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম-শয্যায় পরিণত হইল! ঘন ঘন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। বহুচেষ্টা করিয়াও একবিন্দু ঔষধ তাঁহার গলাধঃকরণ করান গেল না। সমস্ত সাংসারিক সুখদুঃখের, সমস্ত সামাজিক নিন্দা, গ্লানি ও ভয়ের অতীত হইয়া, বৃদ্ধ রাজা শ্রীপুর আঁধার করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

কেদার রায় কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে ঈশা খাঁকে পরাজিত করিয়া বিপুলবেগে নগর আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন—এমন সময়ে দূত যাইয়া চাঁদরায়ের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুতে কেদার রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সোনারগাঁ শ্মশান করিবেন, রাজপরিবারের অপমানকারী উদ্ধত পাঠানের চরম শাস্তিতে হৃদয়ের দারুণ জ্বালা জুড়াইবেন; কিন্তু, অকস্মাৎ সে সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, নিরাশার ভারে তাঁহার হৃদয় মুইয়া পড়িল। শোকার্ত্ত কেদার রায় ভগ্নহৃদয়ে সসৈন্যে রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন।

কেদার রায় জ্যেষ্ঠের পরিত্যক্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণমণিকে আর পাওয়া যাইবে না, পাওয়া গেলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইবে না এবং ঈশা খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য রাজধানী হইতে দূরে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিলে, রাজকার্য্য পরিচালনে বহু বিঘ্ন ঘটিবে ইত্যাদি অনেক বিবেচনা করিয়া কেদার রায়, ঈশা খাঁর সহিত এই ধনজন-

ক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। কেবল ঈশা খাঁকে নির্য্যাতিত করিবার একটা প্রবল বাসনা হৃদয়ের গোপনতলে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

কেদার রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতদিনকার আকাঙ্ক্ষিত ব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মোগলের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার সংকল্পকে সফল করিবার উদ্দেশে তিনি শক্তিসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন। যাহাদের সহিত একযোগে এ ঘোর বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল। যাহাকে প্রধান সহকর্ম্মী মনে করিয়াছিলেন, সেই ঈশা খাঁর সহিত এরূপ শত্রুতা হইল যে, জীবনে আর তাহার মুখদর্শন করা যাইবে না। তবুও কেদার রায় স্বাধীনতালাভের অদম্য প্রেরণায়, একাই মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে স্থিরসংকল্প করিলেন।

রাজ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে কেদার রায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুল উদ্যমে সৈন্যসংগ্রহ চলিতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। সৈন্যদের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে তিনি সামরিক বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ নদীবহুল দেশ; এখানে মোগলকে পরাজিত করিতে হইলে যথেষ্ট নৌবল থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া কেদার রায় তাঁহার নৌশক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরবন্দরে বৃহৎ বৃহৎ রণতরী নির্ম্মিত

হইতে লাগিল। বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের কর্ম্মকোলাহলে কালীগঙ্গার উভয়কূল রাত্রিদিন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজধানীর স্থানে স্থানে কামান ও গোলা-নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইল। তাহাতে বাঙ্গালী কর্ম্মকারগণ দিবারাত্র কার্য্যে ব্যস্ত রহিল। এইরূপে কয়েকবৎসর ধরিয়া বিক্রমপুরাধিপতি ক্রমাগত স্বীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

এমন সময়, ১৬০১ খৃষ্টাব্দে, মোগলসেনাপতি মানসিংহ সসৈন্যে বিক্রমপুরে উপস্থিত হইলেন। কেদার রায়ের উদ্যোগ-পর্ব্ব তখনও শেষ হয় নাই। প্রায় সমগ্রভারতেশ্বর সম্রাট্ আকবরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার শক্তিসঞ্চয় তিনি তখনও করিতে পারেন নাই। কাজেই যুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রবল বিঘ্ন ঘটিবে বিবেচনা করিয়া, তিনি মোগলের সহিত সন্ধি করিলেন। মানসিংহ বিক্রমপুর হইতে ঢাকায় চলিয়া গেলেন। মানসিংহের প্রতিগমনের কয়েকমাস পরেই, সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, কেদার রায় করদান বন্ধ করিয়া পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সেনরাজবংশের পতনের বহুকাল পরে আবার পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুনরপতির রাজপতাকা সগর্ব্বে আকাশে উড্ডীয়মান হইল। সমস্ত বিক্রমপুরে এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। স্বাধীনতার এক অমৃতময় আস্বাদন পাইয়া নরনারী এক নূতন জীবন লাভ করিল এবং এই মহামূল্য সম্পত্তিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিক্রমপুরের যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় হাসিমুখেই প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বঙ্গোপসাগরে সন্দ্বীপ নামে একটি সমৃদ্ধিশালী দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপ তদানীন্তন বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ বিদেশে রপ্তানী হইত। দ্বীপটি সে সময়ে একটি মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত এবং উহার মালিক প্রতিবৎসর বহু অর্থ লাভ করিত।

সন্দ্বীপ অনেকদিন পর্ত্তুগীজদের অধিকারে ছিল। কেদার রায় উহা আপনার অধিকারে আনিবার জন্য বহুবার আক্রমণ করেন। তিনি জলযুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন; তাঁহার বার বার আক্রমণে, পর্ত্তুগীজদলপতি কার্ভালো পরাস্ত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করে। কার্ভালোর বীরত্বে ও নৌযুদ্ধকৌশলে মুগ্ধ হইয়া কেদার রায় তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং বার্ষিক কর গ্রহণে সম্মত হইয়া, তাহারই হস্তে সন্দ্বীপের শাসনভার অর্পণ করেন। শেষে কেদার রায়, কার্ভালোকে তাঁহার জলযুদ্ধবিভাগের প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা সন্দ্বীপ আক্রমণ করিল। কার্ভালো তখন সন্দ্বীপেই অবস্থান করিতেছিল। মোগলেরা বহু রণতরী সহ চারিদিক হইতে দ্বীপ বেষ্টন করিয়া কার্ভালোকে অবরোধ করিয়া ফেলিল। সে শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট ও চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজসেনাপতি এমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্যার্থ সংবাদ পাঠাইল। মাটুস চারিশতসেনাপূর্ণ রণতরী সহ সন্দ্বীপে উপস্থিত হইল। কেদার রায়ও বহু রণতরী সহ নদী ও সাগরবক্ষ কম্পিত করিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

মোগলসৈন্যগণ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু জল হইতে কেদার রায় ও মাটুসের এবং স্থল হইতে কার্ভালোর যুগপৎ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্দ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া কেদার রায় পুনরায় কার্ভালোকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আরাকানের সম্রাট্ মেংরাজগী সেলিমশা বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। বঙ্গোপ-সাগরে পর্ত্তুগীজদের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদের দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি কার্ভালোকে দমন ও সন্দ্বীপ নিজরাজ্যের অন্তর্গত করিবার জন্য বহু রণতরী সহ সন্দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। কার্ভালো তৎক্ষণাৎ শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট সংবাদ পাঠাইল। কেদার রায় অবিলম্বে একশতখানি কামানপূর্ণ 'কোষ' নৌকা সহ সন্দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালী ও পর্ত্তুগীজের বীরত্বে মগসৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কেদার রায়ের রণতরীশ্রেণী বজ্রগর্জ্জনে অনল উদ্গীরণ করিয়া বিরাট ধ্বংসলীলার অবতারণা করিল। কামান ও বন্দুকের ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আগ্নেয়াস্ত্র ও রণোন্মত্ত সৈন্যের গর্জ্জনে বঙ্গোপসাগরের ফেনিল বক্ষ মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। ভীষণ যুদ্ধের পর মগগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ভালো অধিকার করিয়া লইল।

যখন সন্দ্বীপে, বাঙ্গালী-পর্ত্তুগীজ একদিকে ও অন্যদিকে

মগগণের মধ্যে সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, তখন চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজসেনাপতি ফিলিপ ডি ব্রিটো, আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পর্ত্তুগীজদিগের এই ঔদ্ধত্যে ও সন্দ্বীপের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মগরাজ সেলিমশা, ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌শূন্য হইয়া, একসহস্র রণতরীসহ কেদার রায় ও কার্ভালোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মগরাজের বিরাট নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি তরঙ্গায়িত করিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইল। কেদার রায়, তাঁহার নৌসেনাপতি কার্ভালোর সহিত রণতরীশ্রেণী সুসজ্জিত করিয়া মগরাজের গতিরোধ করিলেন। ভয়ঙ্কর অগ্নিক্রীড়া চলিল। কেদার রায় ও কার্ভালোর অদ্ভুত নৌযুদ্ধকৌশলে ও অমানুষিক সাহসে মগরাজ সেলিমশার রণতরীশ্রেণী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। বাঙ্গালী-পর্ত্তুগীজের অজস্র গোলাবর্ষণে তাঁহার অধিকাংশ রণতরী বঙ্গোপসাগরের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অন্যগুলি কতক চূর্ণ-বিচূর্ণ, কতক অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই ভীষণ যুদ্ধে মগদের দুই সহস্র সৈন্য নিহত ও ১৩০ খানি রণপোত ভস্মীভূত হইল। আরাকানরাজ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। কেদার রায় ও কার্ভালোর অপূর্ব্ব বীরত্ব বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে কার্ভালোর প্রায় ৩০ খানি রণতরী ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সে সেইগুলি মেরামতের জন্য, কেদার রায়ের সহিত শ্রীপুরে আসিল।

কেদার রায়ের মগবিজয়কাহিনী বাংলার তদানীন্তন সুবাদার মানসিংহের কর্ণগোচর হইল। কেদার রাজকর বন্ধ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন ও বিপুলবলসঞ্চয় করিয়াছেন একথা মানসিংহ পূর্ব্ব হইতেই শুনিতেছিলেন; কিন্তু, অন্যত্র বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত থাকায়, সে বিষয়ে কোনই প্রতীকার করিতে পারেন নাই। কেদার রায়ের এই মহাবিজয় সংবাদে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। এই উদীয়মান শক্তিকে খর্ব্ব করিতে না পারিলে বাংলায় মোগলের ক্ষমতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া মানসিংহ সুবিখ্যাত নৌসেনাপতি মান্দারায়ের নেতৃত্বাধীনে একশত রণতরী ও বহু সৈন্য কেদার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

যে মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য তিনি এতদিন ধরিয়া আয়োজন করিতেছিলেন, আজ তাহারই সহিত প্রথম সংঘর্ষ। এই প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইলে, নিদারুণ অপমানভরে তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হইবে, বিক্রমপুরের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময় হইবে,—হয়ত বা চিরকাল আনতশিরে মোগলের পদলেহন করিতে হইবে, কিংবা দিল্লীর এক বিভীষিকাময় কারাকক্ষে জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইবে। কাজেই প্রথম যুদ্ধেই কেদার রায়, মোগলসেনাপতিকে সসৈন্যে বিচূর্ণিত করিবার জন্য অতি সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শ্রীপুরাধিপতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন,—রাজ্যমধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গেল। যুবক স্ফীতবক্ষে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা

করিয়া রহিল ; বৃদ্ধের শিথিলহস্ত তরবারিগ্রহণের জন্য কাঁপিয়া উঠিল ; রমণীগণ বিক্রমপুরের স্বাধীনতারক্ষার জন্য পতিপুত্রকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। দেবালয়ে দেবালয়ে শ্রীপুরাধিপতির মঙ্গলকামনা করিয়া উপাসনা চলিতে লাগিল। কেদার রায়ের গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ, গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শিষ্যের মঙ্গল-কামনা করিয়া সমস্ত রাত্রি দেবী ছিন্নমস্তার পূজায় রত ছিলেন, —রণযাত্রার দিন প্রাতে দেবীর আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র কেদার রায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও বৎস, নির্ভয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, মায়ের আশীর্ব্বাদে আজ তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।" কেদার রায় গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও করযোড়ে দেবীর আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া মস্তকে রক্ষা করিয়া হর্ষোৎফুল্লমনে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

কেদার রায়, তাঁহার রণবহর দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ শ্রীপুরের নিকট কালীগঙ্গার মধ্যে রক্ষা করিলেন ও অপর অর্দ্ধেক সহ মোগলসেনাপতির আগমন প্রতিরোধ করিবার জন্য বিক্রমপুরের পূর্ব্বপ্রান্তবাহিনী মেঘনার মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৌসেনাপতি কার্ভালোর নিজের যে ৩০ খানি রণতরী শ্রীপুরে ছিল, তাহাও এই সঙ্গে গেল। অবিলম্বে মোগলসেনাপতি মান্দারায়ের একশত রণতরী অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া, 'আল্লা হো আকবর' রবে নদীর উভয়কূল প্রতিধ্বনিত করিয়া উপস্থিত হইল।

তখন বৈশাখ মাস। অপরাহ্ণে নীলনীরদমালায় গগনতল

আবৃত হইয়া আসিল। শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। উত্তাল তরঙ্গমালায় মেঘনার বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। কাল-বৈশাখীর এই উন্মত্তলীলার মধ্যে বাঙ্গালী ও মোগল রণরঙ্গে মাতিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গের মাথায় নাচিতে নাচিতে উভয়পক্ষের রণতরী অগ্রসর হইতে লাগিল। কামানের গর্জ্জনে, বাতাসের প্রচণ্ড রবে, তরঙ্গের ভীষণ শব্দে, বোধ হইতে লাগিল যেন মহাকাল আজ তাণ্ডবনৃত্যে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রণোন্মত্ত সৈন্যগণের 'আল্লা হো আকবর' ও 'জয় মা ছিন্নমস্তা' রবে দিগন্ত-পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কেদার রায় এক ঐশ্বরিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া বিপুলবিক্রমে মোগল-নৌবাহিনী আক্রমণ করিলেন। বহুক্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। কার্ভালোর অপূর্ব্ব নৌযুদ্ধপরিচালনকৌশলে একে একে মোগলের রণতরী মেঘনার কৃষ্ণবক্ষে নিমজ্জিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেদার রায়ের অধিকাংশ রণতরীই অক্ষত রহিয়া গেল। এক জ্বলন্ত গোলার আঘাতে মোগলসেনাপতি মান্দারায় মেঘনার সুনীলজলতলে চিরবিশ্রামের শয্যা পাতিলেন। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মোগলবাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া, বিজয়-গর্ব্বে কেদার রায় শ্রীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। 'জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়' শব্দে বিজয়োন্মত্ত বাঙ্গালীসৈন্য চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। রাজধানীতে কয়েকদিন ক্রমাগত বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল।

মানসিংহ অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মান্দারায়ের পরাজয় ও নিধন-সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে, তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—একজন সামান্য বাঙ্গালী রাজা মোগলবাহিনীর নাম শুনিলেই ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করিবে। ভীষণ জলযুদ্ধে মোগলবাহিনী পরাজিত হওয়া ও মান্দারায়ের মত বিখ্যাত নৌসেনাপতি নিহত হওয়া তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল। তিনি কেদারের বিজয়ে শঙ্কিত হইয়া কিলম্যাক্ নামক এক মোগলসেনানায়কের নেতৃত্বে এক বিরাট মোগলবাহিনী পুনরায় কেদারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

কিলম্যাক্ শ্রীপুর আক্রমণ করিল। কেদার পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, রণতরী সজ্জিত করিয়া ভীমবেগে মোগল-সেনাপতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। কেদারের রণবহর হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে কিলম্যাকের নৌবাহিনী বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বঙ্গবীরের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কিলম্যাক্ পলায়ন করিল। কেদার রায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বিতাড়িত মোগলসেনাপতি বিলের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ-প্রায় শ্রীনগর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় অসংখ্য রণতরী দ্বারা দ্বীপের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিয়া কিলম্যাক্‌কে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালী সৈন্যগণের বিজয়হুঙ্কারে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল। মোগলসৈন্যগণ প্রাণভয়ে অভিভূত হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিলম্যাকের পরাজয় ও অবরোধকাহিনী মানসিংহের কর্ণ-

গোচর হইলে তিনি প্রমাদ গণিলেন। তিনি ভাবিলেন—মোগলসম্রাটের পতাকা আর বিক্রমপুরে উড্ডীয়মান হইল না, মোগলরাজশক্তির সমস্ত গর্ব্ব আজ বুঝি বাঙ্গালীর হস্তে চূর্ণ হইল! মানসিংহ তখন মগদিগের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন,—তিনি সেই বিরাট মোগলবাহিনীর সহিত বিক্রমপুরে উপস্থিত হইয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। কেদার রায়কে ভয় দেখাইবার জন্য, মানসিংহ একজন দূতের হস্তে একখানি অসি, শৃঙ্খল ও পত্র দিয়া কেদার রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল ঃ—

ত্রিপুর-মগ-বাঙ্গালী-কাক-কুলী-চাকুলী,
সকলপুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ী।
হয়গজনরনৌকাকম্পিতা বঙ্গভূমিঃ
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি ॥

মানসিংহের এই গর্ব্বোদ্ধত পত্র কেদার রায়ের বীরত্বাভিমানে তীব্র আঘাত করিল। বিক্রমপুররাজ অধীনতা-জ্ঞাপক শৃঙ্খল পদদলিত করিয়া সমরসূচক অসি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশে পত্রনবীশ, বৈদ্যবংশীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ সেন মানসিংহের পত্রের এইরূপ উত্তর লিখিয়া দিলেন ঃ—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং,
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে,
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥

পত্র পড়িয়া মানসিংহ অপমানের জ্বালায় অধীর হইলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর সাহসে বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অগণিত রণতরী সহ অবরুদ্ধ কিলম্যাকের সাহায্যার্থে শ্রীনগরে গমন করিলেন।

কেদার রায় বুঝিলেন, এই যুদ্ধের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। হয়ত তিনি এই যুদ্ধের ফলে গৌরবের আলোকদীপ্ত শৈলশিখরে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন—না হয়, অধঃপতনের তিমিরময় রসাতলে প্রবেশ করিবেন—এই যুদ্ধে হয় তাঁহার উত্থান—না হয় চিরকালের মত পতন। কেদার এবার তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগের জন্য স্থিরসংকল্প করিলেন। আবার বিক্রমপুরে এক অভিনব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। বিক্রমপুরবাসিগণ জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তাহাদের নবলব্ধ বিজয়গৌরব অম্লান রাখিবার জন্য, শেষরক্তবিন্দুপর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। কেদার রায়, পাঁচশত রণতরী সহ 'জয় মা ছিন্নমস্তা' রবে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন।

শ্রীনগরের নিকট বাঙ্গালী ও মোগলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেদার রায়ের কামানশ্রেণী প্রলয়ঘনঘোরগর্জ্জনে মোগলবাহিনীর উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। ঘোরতর অগ্নিক্রীড়া চলিতে লাগিল। কেদারের অত্যদ্ভুত সাহস ও পরাক্রম দর্শনে মানসিংহ ভীত হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালী গোলন্দাজ, বন্দুকধারী ও তীরন্দাজগণ প্রমত্ত উৎসাহে যুদ্ধ

করিতে লাগিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে মানসিংহ পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। দ্বিতীয় দিন, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। মোগলসেনাগণ আবার প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেদার ভীমবেগে তাহাদের গতিরোধ করিলেন। কামানের ধূমে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অন্ধকারে বাঙ্গালী ও মোগল কামানের মুখে পরস্পর আত্মপরিচয় দিতে লাগিল। তাহাদের উষ্ণরক্তধারায় বিলের কৃষ্ণজলরাশি রক্তাভ হইয়া উঠিল। এইরূপে ক্রমাগত নয়দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল। মানসিংহ শতচেষ্টা করিয়াও কেদার রায়ের কিছুই না করিতে পারিয়া, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। ভারতের নানা দেশ জয় করিয়া, আজ কি তিনি বাংলায় আসিয়া পরাজিত হইবেন! মোগলের উচ্চ রাজপতাকা আজ কি বিক্রমপুরে লাঞ্ছিত হইবে!

কেদার রায়ের গুরুদেব গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মানসিংহের সহিত যুদ্ধারম্ভের তৃতীয়দিনে, শিষ্যসকাশে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি এ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও। তোমার কোন অমঙ্গল হইবে বলিয়া যেন বোধ হইতেছে।" কেদার রায় বলিয়াছিলেন, "গুরুদেব, এখন এই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মোগলের নিকট মস্তক নত করিতে হইলে, আমি বোধ হয় লজ্জা ও অপমানে আত্মহত্যা করিব। যে-কোনও দৈবানুষ্ঠানে আমার মঙ্গল সাধিত হয়, আপনি অবিলম্বে তাহাই করুন। যুদ্ধবিরতি অসম্ভব।" প্রিয়তম শিষ্যের ঐকান্তিক

অনুরোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা করিলেন।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। অভুক্ত অবস্থায় প্রায়ই তিনি কোন পূজাবন্দনাদি করিতেন না; দিবসে অন্নব্যঞ্জন তাঁহার ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া, সেই প্রসাদগ্রহণান্তর রাত্রিতে পূজাদি করিতেন।

যুদ্ধের নবমদিন রাত্রিতে এই কালীপূজার অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাসময়ে পূজাস্থানে উপস্থিত হইলেন। পূজা উপলক্ষে কেদার রায় সে রাত্রিতে যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিয়াছিলেন এবং গুরুদেবের আগমন অপেক্ষায় পূজামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব আহার করিয়া পূজা করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া, কেদার রায় বিস্মিত হইয়া স্থিরনেত্রে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই ভয়ানক বিরক্তি ও ক্রোধে তাঁহার সমস্ত চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পূজাস্থান ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গুরুদেব, পূজা সাঙ্গ করিয়া, শিষ্যকে মায়ের আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবার জন্য অন্তঃপুরে সংবাদ দিলেন। কেদার রায় আসিলেন না। গুরুদেব পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সেবারে কেদার রায় বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুদ্ধশ্রমে নিতান্ত কাতর আছেন বলিয়া আসিতে পারিবেন না, তাঁহার আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য প্রতিমাসম্মুখস্থ ঘটেই যেন প্রদান করা হয়। গোসাঞিজী

শিষ্যের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, দুণরায় তাঁহাকে অন্য বিশেষপ্রয়োজনে দেখা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবার কেদার রায় পরমতাচ্ছিল্যভরে পূজাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদার রায় আসিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তোমার অমঙ্গল-আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা তুমি শুনিলে না। তোমারই মঙ্গলোদ্দেশে অর্চ্চিত দেবীর নির্ম্মাল্য তুমি উপেক্ষা করিলে। তোমার পরিণাম নিতান্ত অশুভ। আমার প্রতি তোমার এরূপ অশ্রদ্ধায় আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছি। আমি ধনসম্পত্তি বা প্রতিপত্তির লোভে তোমার বাড়ীতে পূজা করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি, শিষ্যের প্রাণরক্ষার জন্য মায়ের করুণা ভিক্ষা করিতে। আজ এই মৃন্ময়ী প্রতিমা আমার পূজায় প্রাণময়ী হইয়াছেন কিনা তাহার প্রমাণ দেখ"—বলিয়া পার্শ্বস্থিত খড়্গদ্বারা প্রতিমার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অমনি দরবিগলিতধারায় ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, কণ্টকিত হইয়া কেদার রায় গুরুদেবের চরণে পতিত হইতে যাইয়া দেখিলেন যে, গোসাঞিজী অন্তর্হিত হইয়াছেন। সেই রাত্রিতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রভাতের প্রথম সূর্য্যকিরণ ধরণীর বক্ষে পতিত হইলেই, আবার কামানের বজ্রগম্ভীর ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আবার সুগম্ভীর রণবাদ্যে বাঙ্গালী

ও মোগলের শিরায় শিরায় রক্তবিন্দু নাচিয়া উঠিল। গতরাত্রির দৈব-দুর্ঘটনায় কেদারের মন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল—তিনি আজ নিতান্ত নিরুৎসাহে ও বিষণ্ণমনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর, শ্রীপুরাধিপতির নৌবহর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কেদার রায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সমস্ত মানসিক অবসাদ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া, সিংহবিক্রমে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি জীবিত থাকিতে জন্মভূমিকে শত্রুকরে অর্পণ করিবেন না—দেশরক্ষার জন্য তিনি আজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিবেন—এই দৃঢ়সংকল্প লইয়া ভীমবেগে রণতরী চালনা করিতে লাগিলেন। জীবনের উপর, সংসারের উপর, আত্মীয়-স্বজন-স্ত্রী-পরিজনের উপর তাঁহার সমস্ত আসক্তি যেন মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িল, কেবল সম্মুখে জ্বলিতে লাগিল,—কলনাদি-নদীনূপুরশোভিতা, শ্যামলশস্যস্তবকমাল্যবিভূষিতা অতীত-কীর্ত্তিমেখলাবিমণ্ডিতা, বাণিজ্যগৌরবকিরীটিনী, প্রাচুর্য্য-হাস্যোদ্ভাসিতাননা দেশজননীর এক কল্যাণময়ী মূর্ত্তি। সেই মহৈশ্বর্য্যশালিনী মাতৃমূর্ত্তির সাধক কেদার, আজ তাঁহারই পাদপীঠে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া শেষ-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য সমরসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পরমবন্ধু কার্ভালো তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুদেব বিমুখ হইয়াছেন,—তবু দেহে ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন থাকিতে কেদার

মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।' এক স্বর্গীয় সুরে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, এক অনির্ব্বচনীয় আবেগে তাঁহার চিন্তাজর্জ্জর দেহে শতমত্তহস্তীর বল আসিল,—কেদার কেবল সংহার-মন্ত্র জপিতে জপিতে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। কেদারের প্রবল উৎসাহে তাঁহার সৈন্যগণের দেহে আবার নববলের সঞ্চার হইল; আবার বিক্ষিপ্ত রণবহর দৃঢ় হইল; আবার বাঙ্গালী সৈন্যগণ 'জয় মা ছিন্নমস্তা' রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল; আবার বাঙ্গালী গোলন্দাজ-গণের শত শত কামান একযোগে গর্জ্জিয়া উঠিয়া প্রলয়লীলার সূচনা করিল।

মানসিংহের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি দারুণ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—আজ তাঁহার বীরত্বাভিমান বাঙ্গালীর হাতে চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই ক্ষিপ্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। দৃঢ়সংবদ্ধ মোগলরণবহর ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে, দুই-একখানি করিয়া রণতরী জলমগ্ন হইতে লাগিল। আর সম্মুখে অগ্রসর হইবার নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া, মানসিংহ ক্রমাগত পশ্চাতে হটিয়া যাইতে লাগিলেন! আর জয়ের কোন আশাই নাই দেখিয়া, তিনি পলায়ন করিবার উপায় স্থির করিতেছেন—এমন সময় মোগলসৈন্যের উচ্চ-জয়োল্লাসধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। উদগ্রীব মানসিংহ তৎক্ষণাৎ সংবাদ লইয়া জানিলেন—মোগলপক্ষের এক জ্বলন্ত

গোলা কেদার রায়ের বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেদার রায়ের পতনসংবাদ পাইবামাত্র, তাঁহার সৈন্যগণ হঠাৎ ভীত হইয়া ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিল। মানসিংহ দেখিলেন, কেদারের রণতরীসমূহ আর অগ্রসর হইতেছে না; এই মহাসুযোগে মানসিংহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে মোগলসৈন্যগণ 'দীন্ দীন্' রবে বাঙ্গালী-রণবহর আক্রমণ করিল। ভয়চকিত, নিরাশাব্যথিত হিন্দুসৈন্যগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে রণতরী চালনা করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেদারের সহকারী সেনানায়কগণ বহুচেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিল না। মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

মোগলসৈন্যগণ, রক্তাক্তদেহ, সংজ্ঞাহীন কেদার রায়কে বহন করিয়া মানসিংহের সম্মুখে লইয়া গেল। মূর্চ্ছান্বিত দেহে তখন ক্ষীণ জীবনস্রোত বহিতেছিল। ধূসর আকাশের মত জ্যোতিহীন চক্ষুদু'টি, দু'একবার, লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে ওদিকে তাকাইতেছিল;—হয়ত বা সংসার হইতে চিরবিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে, মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে, পরপারের অবগুণ্ঠিত রহস্যের সামনে তাঁহার আজীবন সাধনার সফলতার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত, তাঁহার আশৈশব-মনোহারিণী, ঘর-ছাড়ানো, পাগল-করা বাঁশীর সুরদাত্রী বিক্রমপুরের সেই স্বাধীনমূর্ত্তির ছায়ামাত্র, তাঁহার পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিবার সার্থকতার অস্পষ্ট আভাস,

আজ এজন্মের মত একবার দেখিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুতারকা স্থির হইয়া গেল। সেই বাঙ্গালীজাতির গৌরব, পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, মুক্তি-মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কেদারের মৃত্যুর পর, তাঁহার তেজস্বিনী পত্নী, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, রামরাজা সর্দ্দার, কালিদাস ঢালী, ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি সেনাপতিগণের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না; অবশেষে মোগলের হস্ত হইতে বিক্রমপুর রক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মানসিংহ বিক্রমপুর অধিকার করিলেন। তিনি কেদার-পত্নীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বার্ষিক করগ্রহণে তাঁহারই উপর বিক্রমপুরের শাসনভার অর্পণ করিলেন। শ্রীনগরের ভীষণ যুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার্থ মানসিংহ উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম রাখিলেন—ফতেজঙ্গপুর। মানসিংহ, কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত শিলাদেবীকে অম্বরে লইয়া যান। রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম নামক যে শাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে দেবীর পূজারি রূপে মানসিংহ তাঁহার রাজধানীতে লইয়া যান—আজও তাঁহার বংশধরগণ জয়পুরে বাস করিতেছে।

রাজা মুকুন্দ রায়

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষ্‌ণা নামক স্থানে মুকুন্দ রায় রাজত্ব করিতেন। বঙ্গীয় ভৌমিকগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। খরস্রোতা মধুমতীর পূর্ব্বতীরে ভূষ্‌ণা অবস্থিত ছিল। ফতেয়াবাদের কতকাংশ বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। মুকুন্দ রায়ের বংশপরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। কখন, কিরূপে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভূষ্‌ণায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তাহার কোন বিস্তৃত ইতিহাস নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে বিক্রমপুরের ও ভূষ্‌ণার রাজবংশ একই বংশ।

মুকুন্দ রায় প্রথমে সামান্য একজন জমীদারমাত্র ছিলেন। ক্রমে তিনি বুদ্ধিপ্রভাবে ও বাহুবলে দ্বাদশভৌমিকের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে, দায়ুদের পলায়নের পর, মোগলসুবাদার মুনিম খাঁ, মোরাদ খাঁ নামক এক কর্ম্মচারীকে ফতেয়াবাদ ও বাক্‌লার শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। মুকুন্দ তখন প্রবল-পরাক্রমশালী জমীদার। কিছু সময়ের জন্য তিনি মোরাদ খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিলেন; পরে, সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধে মোরাদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

মোরাদ খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উড়িষ্যার পাঠান-দলপতি কতুলু খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলেন। মুকুন্দ, মোরাদ খাঁকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ শক্তি-সঞ্চয় করেন নাই যে, নির্ভয়ে পাঠাননেতার সম্মুখীন হইবেন। তখনও ফতেয়াবাদের উপর তাঁহার আধিপত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মৃত মোরাদের পুত্রগণ ও তাঁহার সৈন্যসমূহ তখনও নানাস্থানে অবস্থান করিয়া দেশবাসীদের নিকট নানারূপ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেছে। এই মহাসঙ্কটে, মুকুন্দ রায়, মোরাদের পুত্রগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন ও তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে মোগলসেনাপতি মুজাফর, কতুলু খাঁকে দমন করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন। এই উভয়শক্তির সম্মুখীন হইতে সাহস না করিয়া, কতুলু খাঁ আবার উড়িষ্যায় ফিরিয়া গেলেন।

মুকুন্দ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন শুনিয়া, বাংলার তদানীন্তন সুবাদার তোডরমল্ল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ফতেয়াবাদে অন্য কোন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত না করিয়া, মুকুন্দ রায়কেই তাহার শাসনভার প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তোডরমল্ল তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিলেন। রাজা মুকুন্দ রায়, মৃত মোরাদ খাঁর পুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া তাহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পথ সুগম করিয়া দিলেন।

মানসিংহের সুবাদারীর সময়, যখন তিনি প্রথমবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রায় গমন করেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে আসফ খাঁর উপর বঙ্গ-বিহারের শাসনভার অর্পিত হয়। বাংলার শাসনভার পাইয়া, আসফ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করিলেন। তিনি ফতেয়াবাদের জন্য এক নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, মুকুন্দ রায়ের হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে ফতেয়াবাদে পাঠাইলেন। মুকুন্দ, এইরূপ মর্ম্মান্তিক অপমানে নিপীড়িত হইয়া, মোগলের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে দাঁড়াইবার জন্য স্থিরসংকল্প করিলেন। মুকুন্দ রায় সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি প্রাণ দিবেন, তবুও নবনিযুক্ত শাসনকর্ত্তার হস্তে ফতেয়াবাদ অর্পণ করিবেন না। তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষাত্রশক্তি ও স্বাধীনতাস্পৃহা একেবারে ভীষণমূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিল। মুসলমান শাসনকর্ত্তা ভূষ্‌ণায় পৌঁছিলে, তিনি তাহাকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন ও অবশেষে তাহাকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বাংলার তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নিকট পৌঁছিলে, তিনি মুকুন্দ রায়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বহু বাদশাহী-সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। মুকুন্দ বুঝিলেন—এইবার তাঁহার শেষ পরীক্ষা। মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে মুকুন্দের মনে দারুণ ঘৃণার উদয় হইল। তাঁহার স্বাধীনতাকামী হৃদয় নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল। তুচ্ছ প্রাণরক্ষার বিনিময়ে অধীনতাশৃঙ্খল গলায় পরিতে তাঁহার শ্বাস

রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি যথাশক্তি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া মোগলসেনাপতির আগমন প্রতিরোধ করিলেন। মুকুন্দ রায় ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার বিক্রমে মোগলসেনাপতি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিরাট মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধে মুকুন্দ রায়ের মুষ্টিমেয় সৈন্য আর কতক্ষণ টিকিতে পারে? প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া, একে একে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরোচিত শয্যা গ্রহণ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে মুকুন্দ রায় সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুকুন্দ রায় মরিলেন—কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার বীরকীর্ত্তি মরিল না। বাংলার একপ্রান্তে সামান্য একজন জমীদার, মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, তাঁহার অগণিত সৈন্যের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া যে প্রাণত্যাগ করিল—এই সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ ও স্বদেশভক্তির কাহিনী বাংলার ইতিহাসে চিরকাল অমর হইয়া রহিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হল্‌কা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

—ভারতচন্দ্র

সার্দ্ধতিনশতবৎসর পূর্ব্বে, যে বীরপুরুষ বাঙ্গালীর ইতিহাসের শৈলশিখরে একবারমাত্র দীপ্ত আভায় উদিত হইয়া, আবার ঘনমেঘে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, এই কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার সেদিনের অপর্য্যাপ্ত আলোকের কয়েকটি ক্ষীণরশ্মি আজও মাঝে মাঝে আমাদের ম্লানমুখের উপর পড়িয়া বিগত দিনের এক অপরূপ স্বপ্ন রচনা করে। তাঁহার দেশভক্তি, তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শ, তাঁহার প্রাণবলিদানের চিরস্মরণীয় কাহিনী, বাঙ্গালীর কাব্যে, সঙ্গীতে কীর্ত্তিত হইয়া আজও তাহার শিথিল-তন্ত্রী চিত্তবীণায় ভৈরবী-মিশ্রিত এক উদ্দাম দীপক-রাগিণীর ঝঙ্কার সৃষ্টি করে।

প্রতাপাদিত্যের বিশাল রাজ্য কবে কোন্ বিস্মৃত দিবসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; তাঁহার বড় সাধের রাজধানী ধূমঘাটের অবস্থান-পর্য্যন্তও আজ নির্দ্দেশ করিতে হইলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় ; মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী আজ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয় ;—তবুও বাঙ্গালীর হৃদয়ে সে রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্যের ছবি আজপর্য্যন্ত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। সেই বঙ্গবীরের গঠনশক্তি, তাঁহার স্বাধীনতাসমরের দীর্ঘশ্বাসতপ্ত কাহিনী, তাঁহার ব্যক্তিগত স্খলন-পতন-ত্রুটি আজও বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসরূপে সর্ব্বত্র ভারাক্রান্তহৃদয়ে আলোচিত হইতেছে। প্রতাপ নাই—কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি-গৌরবের বিলীয়মান সুবাসে এখন বাঙ্গালীর মর্ম্মকানন আমোদিত ; এখনও বাঙ্গালী তিনশতাব্দীর কৃষ্ণযবনিকার অন্তরালে উদিত, আলোকমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, মহিমামণ্ডিত. এই বঙ্গবীরের অচঞ্চল মূর্ত্তির দিকে একবার বক্র গ্রীবায় তাকাইয়া গর্ব্বে ও আনন্দে নিজেকে ধন্য মনে করে।

আদিশূরের আনীত, কায়স্থকুলতিলক বিরাট গুহের বংশে, ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে, সপ্তগ্রামে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। প্রতাপের প্রপিতামহ রামচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া বাংলার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি সপ্তগ্রামে কাননগো-দপ্তরে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ক্রমে ইঁহারাও কাননগো-দপ্তরে কার্য্যে নিযুক্ত হন। ভবানন্দ

এবং গুণানন্দ—উভয়েরই এক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ভবানন্দের পুত্রের নাম শ্রীহরি এবং গুণানন্দের পুত্রের নাম জানকীবল্লভ। এই শ্রীহরিই প্রতাপাদিত্যের পিতা। কিছুকাল সপ্তগ্রামে বাস করিবার পর, এই পরিবারের সহিত কাননগো-দপ্তরের সেরেস্তাদারের বিশেষ মনোমালিন্য হয়। এই মনো-মালিন্যের ফলে, ঐ দপ্তরে কার্য্য করা অসম্ভব মনে করিয়া ভবানন্দ দুই ভ্রাতা, পুত্র ও শিশুপৌত্র প্রতাপের সহিত ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়নগরে চলিয়া আসেন। সোলেমান কররাণী তখন বাংলার মস্‌নদে। সোলেমান নবাগত ভ্রাতৃত্রয়কে নবাব-সরকারে কার্য্য দেন এবং ক্রমে বুদ্ধিপ্রভাবে, দক্ষতায় ও নবাবের অনুগ্রহে, তাঁহারা গৌড়ে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। সেই সময় শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের সহিত যুবরাজ দায়ুদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। সোলেমানের মৃত্যুর পর, দায়ুদ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাঁহার পরমবন্ধু ও প্রিয়পাত্র শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ নবাবদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। দায়ুদ তখন শ্রীহরিকে 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য' ও জানকীবল্লভকে 'রাজা বসন্ত রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কিছুকাল গত হইলে, শ্রীহরি অনুসন্ধানে জানিলেন যে চাঁদখাঁ মস্‌নদ আলী নামক যে ব্যক্তি সুন্দরবনের নিকট যশোর প্রভৃতি স্থান জায়গীর ভোগ করিত, তাহার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, সেই জায়গীর খালি আছে। এই সংবাদ পাইবা

মাত্র তাঁহারা দায়ুদের নিকট ঐ জায়গীর প্রার্থনা করেন। দায়ুদ বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়কে উক্ত রাজ্যের জায়গীর প্রদান করেন। ঐ ।রের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবীর পীঠস্থানে যশোরেশ্বরীর মন্দির বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা এই পুণ্যস্থানে বাস করিতে অভিলাষী হইয়া ঐ স্থানের নিবিড় জঙ্গল কাটান এবং উহাকে এক সুদৃশ্য নগরে পরিণত করেন।

দায়ুদ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া দেখিলেন যে, রাজ-কোষ প্রচুর অর্থে পূর্ণ ও তাঁহার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, সাড়ে তিন হাজার হস্তী, বিশ হাজার কামান ও কয়েক শত রণতরী আছে। এই বিপুল অর্থবল ও সেনাবল দেখিয়া দায়ুদ মোগলদিগকে একেবারে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। মোগলের সহিত দায়ুদের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কয়েকটি যুদ্ধের পর, মোগলসেনাপতি মুনিম খাঁ দায়ুদকে পাটনা-দুর্গে অবরোধ করিলেন। দুর্গ রক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া, দায়ুদ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে, রাত্রিকালে, নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং বিক্রমাদিত্যকে দায়ুদের সমস্ত ধনরত্ন লইয়া কোন নিভৃত স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। বিক্রমাদিত্য দায়ুদের বহু ধনরত্ন লইয়া যশোর-রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই ধনরত্ন আর দায়ুদকে প্রত্যর্পণ করিবার সুযোগ হয় নাই।

দায়ুদের পতনের পর, বঙ্গদেশ মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

হইলে, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কিছুদিন ভয়ে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে, তোডরমল্ল তাঁহাদিগকে অভয় দিলে, তাঁহারা তোডরমল্লের সহিত দেখা করেন এবং তাঁহার আদেশমত সুবার কাগজপত্র সমস্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজ্যের রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্রাদি অক্ষত অবস্থায় পাইয়া, তোডরমল্ল বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভ্রাতৃদ্বয় তখন যশোররাজ্যের ভৌমিকত্ব প্রার্থনা করেন। তোডরমল্ল তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন এবং তাঁহাদিগকে যশোররাজ্যের ভূঞা নিযুক্ত করিয়া বাদশাহের স্বাক্ষরিত ফর্ম্মান প্রদান করেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় যশোরে আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও রাজধানীর উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। দায়ুদের অপর্য্যাপ্ত ধনরত্নে শীঘ্রই যশোর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। এই সময়ে ধনে-জনে ও ঐশ্বর্য্যে যশোর গৌড়নগর অপেক্ষা অধিক উন্নত হওয়ায়, গৌড়ের যশ হরণকারী বলিয়া লোকে উহাকে যশোহর নামে অভিহিত করিতে থাকে। সমাজহীন অবস্থায় বাস করা অসম্ভব মনে করিয়া, বসন্ত রায় চন্দ্রদ্বীপ ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগকে আনাইয়া উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দানে তাহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

গৌড়নগরে অবস্থানকালে, প্রতাপ, প্রচলিত প্রথা অনুসারে,

আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। নানারূপ গোল-যোগে বিক্রমাদিত্য এতদিন পুত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নাই,—যশোহরে আসিয়া তিনি প্রতাপের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রতাপ এখন কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন,—তাঁহার স্নিগ্ধ-শ্যামল চিত্তকুঞ্জে যৌবনের প্রথম দক্ষিণ সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তরুণ যৌবনের আতপ্ত স্পর্শে, হৃদয়ের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শগুলি চক্ষু মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে; এক অদৃশ্য শক্তির আবেশে দেহের শিরা-উপশিরায় এক নববলের অনুভূতি জাগিয়াছে। প্রতাপ আর কিছুতেই পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী, কোন বীরত্বপূর্ণ কার্য্যের মধ্যে তরুণ যৌবন তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য বহুচেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রের প্রাণে পাঠানুরাগ জন্মাইতে পারিলেন না। শাস্ত্র-বিদ্যায় প্রতাপের কোন আসক্তি না থাকিলেও শস্ত্র-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দেখা গেল। শরনিক্ষেপ, অসিচালনা, বন্দুক-ব্যবহার, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষায় তিনি দিবারাত্র মাতিয়া রহিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার এক অপূর্ব্ব প্রতিভা লক্ষিত হইল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার দেহ-মন প্রচণ্ডতেজে দীপ্ত হইয়া উঠিল। অসাধারণ শারীরিক বলের সহিত যুদ্ধস্পৃহা, বীরত্বাভিমান মিলিত হইল। তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত সুন্দরবনের নিবিড় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রায়ই ব্যাঘ্র, বন্যশূকর প্রভৃতি হিংস্রজন্তুশিকারে মত্ত

হইয়া থাকিতে লাগিলেন। সুন্দরবনের শ্বাপদকুল তাঁহার বাহুবীর্য্যে প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

একদিন একটি পক্ষী আকাশের অতি উচ্চস্থান দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। প্রতাপ তাঁহার লক্ষ্যের স্থিরতা পরীক্ষা করিবার জন্য উহার প্রতি তীক্ষ্ণ তীর নিক্ষেপ করেন। বাণাহত পক্ষী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বিক্রমাদিত্যের পদতলে পতিত হইল। নিরীহ পক্ষীর এই প্রকার হত্যায় বিক্রমাদিত্যের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। পুত্রের এই প্রকার নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হইয়া, তিনি প্রতাপের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে, প্রতাপের অমানুষিক নির্ভীকতা, প্রদীপ্ত তেজস্বিতা, অসাধারণ শারীরিকশক্তি ও প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় বিক্রমাদিত্যের মনে একটা আশঙ্কার কৃষ্ণ-মেঘ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। প্রতাপের কোষ্ঠী গণনা করিয়া এক জ্যোতিষী বলিয়াছিল যে, প্রতাপ ভবিষ্যতে পিতৃঘাতী হইবে। বর্ত্তমান মনোবৃত্তিই হয়ত ভবিষ্যতে তাঁহাকে এই মহাপাপে লিপ্ত করিতে পারে, এই মনে করিয়া বিক্রমাদিত্য শিহরিয়া উঠিলেন। বিক্রমাদিত্য বহু বিবেচনার পর স্থির করিলেন যে, প্রতাপের বিবাহ দিবেন। নবীন যৌবনে নারী-প্রেমের কোমল স্পর্শ পাইলে হয়ত তাঁহার উদ্দাম প্রকৃতি শান্ত ও সংহত হইতে পারে, হয়ত যৌবনের প্রখরতা গলিয়া গিয়া বিলাস ও আরামের দিকেই তাঁহার সমস্ত দেহ-মন ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে—এই মনে করিয়া, বিক্রমাদিত্য মহাসমারোহে

জিতামিত্র নাগের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীর সহিত প্রতাপের বিবাহ দিলেন। কিন্তু সে অস্ত্র ব্যর্থ হইল। সে নাগপাশ প্রতাপকে বাঁধিতে পারিল না। বিবাহে তাঁহার প্রকৃতির ভীষণতা কিছুমাত্র কমিল না। তখন নিরুপায় হইয়া বিক্রমাদিত্য প্রতাপকে রাজধানী আগ্রা পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। রাজধানীতে বিভিন্নপ্রকারের বহু লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় ও মেলামেশা করিলে তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, মোগলের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার উত্তাল তরঙ্গ হয়ত তাঁহার হৃদয়তটে আঘাত করিয়া, তাঁহার বজ্র-কঠোর মনোবৃত্তির উন্নত তটভূমি ধ্বংস করিয়া দিতে পারে, এই মনে করিয়া তিনি প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইলেন। প্রতাপ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভারতের অনেক কীর্ত্তিভূয়িষ্ঠা প্রাচীননগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে লাগিলেন। এক মহাশক্তিশালী হিন্দুজাতির শেষ পরিণাম-চিন্তায় তাঁহার দুইচোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতাপ ভাবিলেন—আজ হিন্দুর অতীতকীর্ত্তিমণ্ডিত এই হিন্দুস্থান মোগলের চরণতলে মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে। আর দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত হিন্দু আমরা নিজের জন্মভূমিতে পরাধীন হইয়া মোগলকেই প্রভু বলিয়া মানিতেছি। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই ? আজও বাংলার অধিকার লইয়া মোগলে-পাঠানে যুদ্ধ করিতেছে, আর আমরা সেই দেশবাসী হইয়া নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া, আজ এক বিজেতাকে, কাল অন্য বিজেতাকে

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বেড়াইতেছি। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর বিধান! আগ্রায় পৌঁছিলে সম্রাট্-দরবারে প্রতাপ বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন।

প্রতাপ যখন আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য, আকবরের সহিত সেই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে লিপ্ত। প্রতাপাদিত্য, রাণা প্রতাপের অটল প্রতিজ্ঞা, অবিচলিত দৃঢ়তা, অদ্ভুত বীরত্ব ও অতুল্য দেশ-প্রেমের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য শুনিলেন যে, রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপ, বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, স্ত্রীপুত্র লইয়া পলায়ন করিয়া বেড়াইতেছেন, তবুও মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন না,—তাঁহার মাথার উপর মোগল গুপ্ত-ঘাতকের খড়্গ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, পুত্রকন্যা ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার চারিদিকে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কাল কি খাইবেন, কোথায় মাথা রাখিবেন, তাহার স্থিরতা নাই,—তবুও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই,—তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন, তবুও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নন। প্রতাপসিংহের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রতাপাদিত্যের মন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি রাণা প্রতাপের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসি, হে মহান্ দেশপ্রেমিক, আমি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া তোমাকে বার বার প্রণাম করিতেছি,—কোন দেশে, কোন যুগে, তোমার মত স্বাধীনতার উপাসক জন্মিয়াছে কিনা জানি না। আজ তোমার মত সাধকের নিকট হইতে

স্বাধীনতামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিলাম।' আশীর্ব্বাদ ক'রো গুরুদেব, তোমার এই অচেনা শিষ্য যেন গুরুদেবের কিছুমাত্র সাধনার অংশভাগী হয়।”

কিছুদিন আগ্রায় অবস্থান করার পর, প্রতাপ আকবরের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেন। সম্রাট্, প্রতাপের বীরত্ব-ব্যঞ্জক দেহশ্রী ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহার সহিত নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রতাপা-দিত্যের ইচ্ছা হইল, তিনি যশোহররাজ্যের ভার নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মনের মত করিয়া গঠন করেন। সম্রাটের মনোভাব তাঁহার প্রতি অনুকূল জানিয়া, তিনি যশোহররাজ্যের সনন্দ নিজনামে পাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। আকবর সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

বাদশাহী সনন্দ লইয়া প্রতাপ যশোহরে ফিরিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে প্রতাপ যশোহররাজ্য শাসনের অনুমতি-পত্র লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন—নিরন্তর শরীরচর্চ্চা ও প্রাণিহত্যা ছাড়িয়া, এবার রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, প্রতাপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতাপের হস্তে যশোহররাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু প্রতাপ, পিতা জীবিত থাকিতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই।

পরলোকযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে মনে করিয়া,

দূরদর্শী বিক্রমাদিত্য, ভবিষ্যৎ গোলযোগ নিবারণের জন্য, যশোহররাজ্য বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল—তাঁহার মৃত্যুর পর খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে একটা তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইবে। বিক্রমাদিত্য, সম্পত্তি ভাগ করিয়া দশ-আনা অংশ প্রতাপকে ও ছয়-আনা অংশ বসন্ত রায়কে দিলেন। বসন্ত রায় রাজ্যের পশ্চিমদিক পাইলেন—আর প্রতাপ পাইলেন পূর্ব্বদিক। ইহার অল্পদিন পরেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইল।

নিজের হাতে এক রাজ্য গড়িবার ও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার আশায়, প্রতাপ, যমুনা ও ইছামতীর নিকটে, ধূমঘাট-নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেই স্থানের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তিনি পঞ্চক্রোশব্যাপী এক বিশাল নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন; শেষে দুর্গ ও পরিখা দ্বারা উহা সুরক্ষিত করিলেন। ধূমঘাট এক ধনজনপূর্ণ নগরে পরিণত হইল। প্রতাপের এই ধূমঘাটই যশোহররাজ্যের রাজধানী ছিল। মহাসমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্ত রায়ের সভাপণ্ডিত ও গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিবার পর, প্রতাপ যশোরেশ্বরীর মন্দির নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূমঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈশ্বরীপুরে দেবীর পীঠস্থানে পুরাতন মন্দির লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; প্রতাপ সে স্থানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া,

তাঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এতদিনের অনাদৃত ধ্বংসস্তূপের উপর এক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করায় ও তাঁহার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায়, জনসাধারণের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, দেবী কালী তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং কালীর অনুগ্রহেই প্রতাপের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। জনসাধারণের দৃঢ়প্রত্যয় তাঁহার মনের উপর সংক্রামিত হইল,—তিনিও দেহ-মনে এক ঐশ্বরিক শক্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল যাত্রার প্রথমে, যে পাথেয়ে তাঁহার হাত ভরিয়া উঠিল, তাহার সেই অলক্ষ্য, দুর্নিবার শক্তিতে, নির্ভয়ে যাত্রার শেষে পৌঁছিতে পারিবেন—এই আশায় তাঁহার হৃদয়, উৎসাহ ও প্রফুল্লতার মৃদু উত্তেজনায় সজাগ হইয়া উঠিল।

এইবার প্রতাপ এতদিনকার আকাঙ্ক্ষিত ব্রত-আরম্ভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভালরূপ জ্ঞান হইবার পর হইতেই পরাধীনতার যে বেদনা তাঁহার মনে ক্রমেই পর্ব্বতের মত চাপিয়া পড়িতেছিল, তাহার ভার আর তিনি বহিতে পারিতে-ছিলেন না। নিজের দেশকে মোগলের কবলমুক্ত করিয়া, তাহার নিজস্ব বিশেষত্বের পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করিয়া, সর্ব্ব-সম্পদের প্রাচুর্য্যে তাহাকে মহিমাময়ী করিবার এক মহান্ আদর্শকে প্রতাপ আলোকস্তম্ভের ন্যায় তাঁহার চিত্তদুয়ারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যদি এ দুর্গম পথের সহযাত্রী না পান, যদি বাংলার অন্যান্য ভূঞাগণ মোগলের পদলেহন করিতে

প্রস্তুত হয়, পাঠান বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া বাংলা ছাড়িয়া পলায়ন করে—তবুও তিনি তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিবেন না। তাঁহার নিজের দেশকে প্রকৃত নিজের বলিতে না পারিলে, নিজের বাসভূমিতে পরের নির্দ্দেশে চলার প্রাণান্তকর অপমান ও গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, জীবনধারণের সমস্ত আয়োজন ত অর্থহীন, প্রাণশূন্য ও পরম লজ্জাকর। সমস্ত বিশেষত্ববর্জ্জিত হইয়া, মোগলের আদেশমত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার তিল তিল মৃত্যু অপেক্ষা একেবারে অমরমরণ বরণ করাই অধিক আনন্দের, অধিক গৌরবের। তিনি দেশের ও জাতির পরাধীনতার প্রতিবাদ করিবার জন্য মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন উড়িষ্যায় মোগল-পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। কতুলু খাঁ, বিচ্ছিন্ন পাঠানশক্তিকে একত্র করিয়া পূর্ণবিক্রমে মোগলের সহিত লড়িতেছিলেন। কতুলু প্রতাপাদিত্যের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। প্রতাপ পিতৃবন্ধু কতুলুকে সাহায্য করিবার জন্য উড়িষ্যায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উড়িষ্যাযাত্রার প্রারম্ভে, বসন্ত রায় প্রতাপকে উড়িষ্যা হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ আনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। প্রতাপ পিতৃব্যবাক্য মাথায় করিয়া উড়িষ্যায় আসিলেন। উড়িষ্যার কার্য্য শেষ করিয়া বাংলায় ফিরিবার সময় তিনি বিগ্রহদুইটিকে লইয়া বাংলা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দুইবিগ্রহ উৎকলবাসি-গণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল। বিগ্রহ স্থানান্তরিত

হইবার সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। উড়িষ্যার রাজন্যমণ্ডলী ক্রোধে ও দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অগণিত সৈন্যসহ প্রতাপের পথরোধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বীর প্রতাপ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি অসীম সাহসের সহিত উৎকলীয়গণের সম্মুখীন হইলেন। সুবর্ণ-রেখাতীরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাজন্যবর্গ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। প্রতাপ বিগ্রহসহ বিজয়োল্লাসে যশোহরে ফিরিলেন। বসন্ত রায় পুলকিত হইয়া, পরমস্নেহে সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া শির আঘ্রাণ করিলেন। শুভ-দিনে বিপুল সমারোহের সহিত, বসন্ত রায় বিগ্রহদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উৎকলেশ্বর মন্দিরের প্রস্তরফলকে এই শ্লোকটি লিখিত আছে দেখা গিয়াছে :—

নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্,
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্।
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্ত রায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ ॥

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতাপ মোগল-দরবারে রাজকরপ্রেরণ বন্ধ করিলেন। যথাসময়ে তাগিদ আসিল। তিনি ঘৃণাভরে তাহা উপেক্ষা করিলেন। তিনি মোগলের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে অগ্রসর হইলেন।

আজিম খাঁ তখন বাংলার সুবাদার। তাঁহার সেনাপতি

ইব্রাহিম খাঁ তখন বাংলা ও উড়িষ্যার বিদ্রোহদলনে সর্ব্বদাই সসৈন্যে, সচকিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। আজিম খাঁ, প্রতাপ বিদ্রোহী হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, ইব্রাহিম খাঁকে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ বিশাল মোগলবাহিনীর সহিত যশোহর যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ মোগলসেনাপতির সম্মুখীন হইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এইবার প্রথম তিনি প্রবল মোগলরাজ-শক্তির সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। এই জয়-পরাজয়ে তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইবে। বিপুল উৎসাহে প্রতাপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মৌতালার নিকট বাঙ্গালী-মোগলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাস্বাদিত স্বাধীনতার এক অভিনব উত্তেজনায়, প্রতাপ ও তাঁহার সৈন্যগণ ভীম-পরাক্রমে যুদ্ধ করিল। প্রতাপ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ছুটিয়া বেড়াইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগলসেনাপতি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া যশোহর হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। রাজধানীতে ক্রমাগত কয়দিন বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল।

ইব্রাহিম খাঁর পরাজয়-সংবাদ পাইয়া ও প্রতাপের ক্ষমতা দিন দিনই বাড়িতেছে দেখিয়া, আজিম খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মোগলসম্রাটের তিনি অন্যতম প্রধান সেনাপতি। তাঁহার রণকৌশল তখন চারিদিকে প্রশংসিত।

আজিম খাঁ, অগণিত সৈন্য, বহুসংখ্যক মুসলমান আমীর ও বহু হস্তী-অশ্ব লইয়া যশোহরে উপস্থিত হইলেন। এত শীঘ্র আজিম খাঁ, প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, প্রতাপ কোন প্রকার আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করেন নাই। বিরাট মোগলবাহিনীকে বাধা দিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি মোগলসেনাপতির সহিত সন্ধি করিলেন।

আজিম খাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের পর, প্রতাপ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁহার শক্তির দিকে একবার তাকাইলেন। স্বাধীনতার মোহে অন্ধ ও বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া এতদিন প্রতাপ নিজের প্রকৃত শক্তির দিকে তাকান নাই। তিনি অমিতশক্তি মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে যাইতেছেন, কিন্তু মোগলের তুলনায় তাঁহার শক্তি কত কম! আজ তিনি ভেলায় সমুদ্র পার হইতে যাইতেছেন দেখিয়া, নিজের মূর্খতায়, অপরিণামদর্শিতায় ও মিথ্যা-অহঙ্কারে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, মোগলের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে পারার মত শক্তিসংগ্রহ করিতে না পারিলে, আর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার অসার আড়ম্বর করিবেন না। তিনি সমস্ত আমোদ, বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সামরিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য দিবারাত্র চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

যশোহররাজ্য এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যে উষ্ণ হইয়া উঠিল। প্রতাপ দেখিলেন, জলশক্তি ও স্থলশক্তি উভয় শক্তিতে বলীয়ান্

না হইতে পারিলে তিনি মোগলের সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। তিনি উভয়শক্তি বাড়াইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের মধ্যে ও সীমান্তপ্রদেশে, তিনি বহু দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপুর, মুকুন্দপুর, মৌতালা, গড়-প্রতাপনগর, গড়-কমলপুর, বড়িশা, বেহালা, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্ম্মিত হইল। কুশলীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বাঙ্গালীসৈনিকগণ প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিল। দুধলী নামক স্থানে রণতরী নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্য চলিতে লাগিল এবং নৌসেনাগণ জলযুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিল। রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে গোলা-গুলি নির্ম্মাণের জন্য বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইল। উন্নত প্রণালীতে আগ্নেয়াস্ত্রব্যবহার ও নৌযুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য প্রতাপ পর্ত্তুগীজ সেনাপতি-দিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাংলার নানাপ্রান্ত হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া তাঁহার সেনাদল পুষ্ট করিতে লাগিল। তাঁহার সামরিক বল উপযুক্তভাবে পরিচালনের জন্য, তিনি এক এক বিভাগের ভার এক একজন সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিলেন। সূর্য্যকান্ত গুহকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন ও নিম্নলিখিত বিভাগে নিম্নলিখিত যোদ্ধৃগণকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যবিভাগ—রঘুরাম।

গুপ্তসৈন্যবিভাগ—সুখময়।

ঢালি বা পদাতিক সৈন্যবিভাগ—মদনমল্ল।

গজারোহী ও অশ্বারোহীসৈন্যবিভাগ—প্রতাপদত্ত।

নৌসৈন্য ও গোলন্দাজসৈন্যবিভাগ—রডা।

তীরন্দাজসৈন্যবিভাগ—সুন্দর।

কমল খোজা নামক আর একজন বিখ্যাত যোদ্ধাকে প্রতাপ, তাঁহার এক সৈন্যদলের নেতৃত্বভার প্রদান করিলেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ যুবককে প্রতাপ, তাঁহার সৈন্য-সংগ্রহ, দেশের মধ্যে জাতীয়চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার ও সাধারণ-ভাবে সামরিক শক্তির সংগঠন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। জাহাজঘাটা নামক স্থানে বহু যুদ্ধজাহাজ প্রয়োজনের অপেক্ষায় রক্ষিত হইল। সাগরদ্বীপই প্রতাপের নৌবহরের প্রধান আড্ডা হইল। এই স্থানকেই বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন। এখানে অসংখ্য রণতরী সুসজ্জিত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৌশক্তি ও স্থলসৈন্যশক্তিতে প্রতাপ প্রবলশক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। আয়োজনপর্ব্ব শেষ হইলে নিজেকে মোগলের আক্রমণে বাধা দিবার উপযুক্ত মনে করিয়া প্রতাপ পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। শক্তিদাত্রী কালিকার আশীর্ব্বাদে প্রতাপ এক মাহশক্তিতে বলীয়ান্ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বাংলার নানাপ্রান্তে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

এমন সময় প্রতাপাদিত্যের জীবনের শুভ্র শতদলের উপর এমন বিষকীট দংশন করিল যে, তাহার জ্বালায়, তাহার গভীর ক্ষতের গ্লানিতে, তাহার বীভৎসতার নিন্দায়, তাঁহার সমস্ত

জীবন কুৎসিত ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়া গেল। সে কাহিনী যেমনই ভয়ানক, তেমনই করুণ এবং প্রতাপ-চরিত্রের দুইটি বিভিন্নদিকের যুগপৎ দৃষ্টান্ত। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় শৈশবাবধি প্রতাপকে খুবই স্নেহ করিতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের মন বসন্ত রায়ের প্রতি ক্রমেই বিমুখ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যেন বসন্ত রায় তাঁহার নিজের পুত্রগণের উপরেই অধিক স্নেহ বর্ষণ করেন, এবং তাঁহাকে মৌখিক মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিলেও নিরপেক্ষভাবে তাঁহার স্নেহ সমস্ত ভ্রাতৃগণের উপর বর্ষিত হয় না। প্রতাপ বসন্ত রায়ের সমস্ত কার্য্যেই একটা পক্ষপাতিতা ও কপটাচার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার তরুণ মনে অলক্ষ্যে এক বিদ্বেষের বীজ রোপিত হইল। যখন পিতার আদেশে প্রতাপ আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, খুল্লতাতের প্ররোচনাতেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছেন। তরুণ যৌবনে আত্মীয়স্বজন, নবপরিণীতা স্ত্রী, বন্ধুবান্ধবকে ছাড়িয়া শ্যামলপল্লীমাতার স্নেহ-তপ্ত বক্ষের নিবিড় আলিঙ্গন হইতে বিচ্যুত হইয়া, কোন এক সুদূর দেশে, অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে, বহু সঙ্কোচের তীরে পদে পদে বিদ্ধ হইবার কল্পনায় তাঁহার মন অত্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এই নির্ব্বাসনের মূলে যে একমাত্র বসন্ত রায়ের পরামর্শ বর্ত্তমান, এই ধারণা করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ ও আক্রোশে প্রতাপের মন প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা হইতে ফিরিবার পর, নানারূপ রাজকার্য্যে নিবিষ্ট থাকায় ও পিতৃবিয়োগে তাঁহার চিত্ত আহত হওয়ায়, কিছুদিনের জন্য বসন্ত রায়ের প্রতি তাঁহার মনের উষ্ণতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল।

খুল্লতাতের সহিত পৃথক্ হইয়া ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপনের কিছুদিন পর, আবার বসন্ত রায়ের প্রতি তাঁহার মনের সুপ্তবিদ্বেষ জাগরিত হইতে আরম্ভ করে। চকশ্রী নামক একটি পরগণা, বিভাগের সময়, বসন্ত রায়ের অংশে পড়ে। প্রতাপ সেই স্থানটি তাঁহার নৌবাহিনী ও রণবহর রাখিবার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বসন্ত রায়ের নিকট উহা প্রার্থনা করেন এবং পরিবর্ত্তে অন্য একটি পরগণা দিতে প্রস্তাব করেন। প্রতাপ বহুবার চকশ্রীর জন্য প্রার্থনা করিলেও বসন্ত রায় কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন দেখিয়া, বসন্ত রায় বারবার তাঁহাকে ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। বসন্ত রায় মোগল বাদশাহের প্রভূত ঐশ্বর্য্য, বিপুল সামরিক শক্তি ও অমিত পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া, তুলনায় প্রতাপের শক্তিহীনতা দেখাইয়া, তাঁহাকে এরূপ নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ করিয়া দিতে লাগিলেন যে, স্বাধীনতা-লাভের চিন্তা তাঁহার নিকট উন্মত্তের চিন্তার মত বোধ হইতে লাগিল। বসন্ত রায় প্রতিনিয়ত এই বিষয়ে প্রতাপকে উপদেশ দিতে ও মৃদুভৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রতাপ বসন্ত রায়ের

এই উপদেশ একেবারেই সহ্য করিতে পারিলেন না। যাহা তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যে আশার অনির্ব্বাণ প্রদীপ তিনি হৃদয়ে জ্বালাইয়া জীবনপথে যাত্রা করিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা তাঁহার জীবনে আর কোন লোভনীয় বস্তুই নাই, সেই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বার স্রোত এইভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে প্রতাপ বসন্ত রায়কে নিজের উন্নতি-পথের প্রবল বিঘ্ন মনে করিতে লাগিলেন। প্রতাপ ভাবিলেন যে, খুল্লতাত যেরূপ মোগলের পদলেহন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকেও সেই প্রাণান্তকর অপমান-ভার মাথায় চাপাইয়া, ধন্য করিতে না পারিলে কিছুতেই তিনি শান্তি পাইবেন না। প্রতাপ ঘৃণাভরে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ;—বসন্ত রায়ও প্রতাপের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে দুইজনের মধ্যে এতখানি ব্যবধান রচিত হইল যে, একে অপরকে শত্রু মনে করিয়া অনিষ্টচিন্তা পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। বসন্ত রায়ের পুত্রগণ তাঁহার বিদ্বেষবহ্নিতে আরও ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। তাহারা প্রতাপের দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করাইয়া ক্রমাগত তাঁহাকে প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

এইরূপে যখন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল, তখন বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হইল। মনে মনে ঘোরতর

মনোমালিন্য থাকিলেও বাহ্যতঃ বসন্ত রায় প্রতাপের মত নিকট-আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ না করিয়া পারিলেন না। প্রতাপও নিমন্ত্রণরক্ষার্থ শ্রাদ্ধদিনে যথাসময়ে পিতৃব্যভবনে উপস্থিত হইলেন—কিন্তু আত্মরক্ষার্থ একখানি তরবারি পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে কক্ষে বসন্ত রায় শ্রাদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন; প্রতাপ কক্ষদ্বারে পদার্পণ করিয়া শুনিলেন যে, বসন্ত রায় একজন ভৃত্যকে সত্বর গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করিতেছেন। বসন্ত রায়ের একখানি প্রিয় তরবারির নাম ছিল গঙ্গাজল। গঙ্গাজলের নাম শুনিয়া প্রতাপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহাকে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় অন্তঃপুরে পাইয়া হত্যা করিবার জন্যই এই বিরাট ষড়যন্ত্র হইয়াছে এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্রই খুল্লতাত তরবারি আনিতে আদেশ করিতেছেন। অন্তঃপুরের এক নিভৃত অংশে অসহায় এক নিমন্ত্রিত আত্মীয়কে হত্যা করিবার পৈশাচিক সংকল্প দেখিয়া তাঁহার দেহ-মন শিহরিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, ভীরুর মত তাঁহার কণ্ঠ আগাইয়া দিবেন না, বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবেন। এই মনে করিয়া, প্রতাপ তাঁহার লুক্কায়িত তরবারি বাহির করিলেন। বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায় অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি বসন্ত রায়ের কক্ষদ্বারে প্রতাপকে তরবারি বাহির করিতে দেখিয়া মনে করিলেন যে, প্রতাপ তাঁহার পিতাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

একটা উচ্চ চীৎকারে সমস্ত অন্তঃপুর সচকিত করিয়া গোবিন্দ রায় লাফ দিয়া পড়িলেন ও গৃহাভ্যন্তর হইতে তাঁহার ধনুর্ব্বাণ আনিয়া প্রতাপের শির লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। তীর প্রতাপের কেশ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ রায়ের এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে প্রতাপের মনে সন্দেহের যবনিকা অপসারিত হইয়া গেল। তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, আজ এই শ্রাদ্ধদিনে তাঁহার উষ্ণরক্ত পিতৃপুরুষকে নিবেদন করাও খুল্লতাতের একটি উদ্দেশ্য। তিনি তরবারিহস্তে গোবিন্দ রায়ের দিকে ধাবিত হইলেন ও এক আঘাতেই তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অন্তঃপুরমধ্যে একটা তুমুল কোলাহল ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বসন্ত রায়ের অন্যান্য পুত্রগণ ও পরিজনবর্গ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া একযোগে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ একাকী তাহাদের সহিত প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই প্রতাপের হস্তে নিহত হইল। এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে বসন্ত রায় শোকে, দুঃখে উন্মত্তবৎ হইয়া প্রতাপকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে 'গঙ্গাজল' তরবারি আনিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তরবারি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রতাপের তরবারির আঘাতে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড মাটিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। অন্তঃপুরে রক্তগঙ্গা বহিল। চীৎকার, আর্ত্তনাদ, ক্রন্দন, হায় হায় শব্দে, অন্তঃপুরের বাতাস রুদ্ধ হইয়া তথায় এক শ্মশানের বীভৎসতা ফুটিয়া উঠিল। বসন্ত রায়ের পত্নী, শিশুপুত্র রাঘবকে লইয়া

খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইয়া কচুবনে আত্মগোপন করিলেন। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল ফলিল। পিতৃস্থানীয় পিতৃব্যকে হত্যা করায় তাঁহার পিতৃঘাতী হইবার আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইল। আর রাণী রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে তিনি সর্ব্বত্রই কচু রায় নামে অভিহিত হন।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর বসন্ত রায়ের জামাতা রূপ বসু বসন্ত রায়ের একমাত্র জীবিতপুত্র রাঘবের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে উড়িষ্যায় ঈশা খাঁ লোহাণীর নিকট গোপনে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাঁ লোহাণী তখন উড়িষ্যায় আধিপত্য করিতেছিলেন। বসন্ত রায়ের সহিত তাঁহার বহুদিন হইতে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। বন্ধুর এইরূপ শোচনীয় পরিণাম শুনিয়া ও তাঁহার পুত্রের এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তিনি রাঘবকে সাদরে আশ্রয়দান করিলেন।

বসন্ত রায়ের হত্যার পর, তাঁহার অংশ প্রতাপের রাজ্যভুক্ত হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত যশোহররাজ্যের একাধীশ্বর হইলেন। এখন পূর্ব্বে মধুমতী, পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে সমুদ্র—এই বিশাল যশোহররাজ্য তাঁহার করায়ত্ত হইল। তিনি অর্থবলে, সৈন্যবলে, লোকবলে ও দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রায় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের মহাশক্তিশালী অধীশ্বর-রূপে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার

কন্যা ইন্দুমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। কিন্তু এই বিবাহের এক সকরুণ স্মৃতি জনশ্রুতি ও উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইয়া আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর মনে একটা উদাস কৌতূহলের সৃষ্টি করিতেছে। আলোকোজ্জ্বল বিবাহরাত্রের আমোদোৎসবের অবসানের পর, মধ্যরাত্রে এক হৃদয়ভেদী দুঃখের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। জামাতা রামচন্দ্রের সহিত রমাই ঢুঙ্গী নামে একজন বিদূষক আসিয়াছিল। বিবাহের পর, বাসরগৃহে যখন সমবেত রমণীগণ কন্যা-জামাতাকে লইয়া রহস্যালাপে নিযুক্ত ছিল—তখন রমাই নারীবেশে সজ্জিত হইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। নানারূপ আলাপের মধ্যে রমাই রাণীকে এরূপ একটি অভদ্র ও কুৎসিত পরিহাস করে যে, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অপমানিত হন। অবিলম্বেই যখন জানা গেল যে, পরিহাস-কারিণী স্ত্রীলোক নহে, বরপক্ষের বিদূষক, তখন নারীমহলে নিক্ষিপ্তলোষ্ট্র-মধুচক্রের ধ্বনির মত একটা লজ্জিত কলগুঞ্জন উত্থিত হইল। রমণীগণ অবগুণ্ঠনে অবনত মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল। রাণী নিদারুণ লজ্জায় কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতাপের নিকট যাইয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রতাপ জামাতার একজন অনুচরের হস্তে পত্নীর এইরূপ অবমাননায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া, জামাতা ও রমাই ঢুঙ্গী উভয়েরই প্রাণ-বিনাশের আদেশ দিলেন। মধ্যরাত্রে নির্জ্জন বাসরকক্ষে এই সংবাদ পৌঁছিলে বালিকাবধূ ইন্দুমতী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। সে পিতার স্বভাব ভাল করিয়াই জানিত—এ আদেশ

যে কিছুতেই প্রত্যাহৃত হইবে না, তাহাই ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সে স্বামীর নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিল। কিশোর-বয়স্ক রামচন্দ্র এই বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ইন্দুমতী তাহার নারীসুলভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে স্বামীকে রক্ষা করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সে অন্তঃপুর হইতে পশ্চাদ্দিক দিয়া বাহির হইবার একটা গুপ্তপথের সন্ধান জানিত। সে গোপনে, সেই রাত্রে, স্বামীকে সেই পথ দিয়া বাহির করিয়া দিল। রামচন্দ্র বাহির হইয়া যেখানে তাঁহার শরীররক্ষী সৈন্যগণ ও কামানসজ্জিত নৌকা অবস্থান করিতেছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। দ্রুতগামী তরণী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া মাধব-পাশা-অভিমুখে বায়ুবেগে ছুটিল। এই ঘটনায় দুই রাজ-পরিবারের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল, তাহার ফলে ইন্দুমতীকে, তাহার নবোন্মিষিত যৌবনে শ্বশুরালয়ের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে ছায়ার মত ম্লান ও বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল।

তখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের বহুস্থান শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধভাবে হঠাৎ এক গ্রামের উপর পতিত হইয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভীষণ অত্যাচার করিত; কখনও বা সুন্দরী যুবতী বা বালকবালিকাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিদেশে দাসরূপে বিক্রয় করিত। প্রতাপ দেশের এই ঘোরতর শত্রু পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে দমন করিবার

জন্য, কৃতসংকল্প হইলেন। মগরাজ চিরদিনই পর্ত্তুগীজ দস্যু-দিগের শত্রু। প্রতাপ আরাকানরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্যে ও স্বীয় অসাধারণ বাহুবলে পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। এই সময়ে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে, বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নৌসেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীপুর ছাড়িয়া প্রতাপের নিকট চলিয়া আসে। তাহার বিশ্বাস ছিল, প্রতাপ বীর, তিনি বীরের সম্মান বুঝিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু, ফল ফলিল বিপরীত। কার্ভালো যশোহরে উপস্থিত হইয়া রাজসভায় কয়েকদিন যাতায়াত করিবার পরই আরাকানরাজের উত্তেজনায় একদিন মধ্যরাত্রে কতিপয় অনুচরের সহিত তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অসমসাহসিক পর্ত্তুগীজ বীরের জীবনদীপ এইভাবে গুণের উপযুক্ত পুরস্কার-তৈল বিহনে অকালে নিবিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে, প্রতাপ তাঁহার অখণ্ড স্বাধীনতার নিদর্শনস্বরূপ নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। মুদ্রার একপৃষ্ঠে লিখিত ছিল—শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য, অন্য পৃষ্ঠে—বদৎছিক্কাবছিমো বাঙ্গালা মহারাজ প্রতাপাদিত্য জব্দাল।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে কেদার রায়ের পতনের পর মানসিংহ আগ্রায় চলিয়া গেলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট্ আকবরের মৃত্যু হইলে সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে

আরোহণ করিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে, উড়িষ্যার ঈশা খাঁ লোহাণীর তিরোধানের পর কচু রায় ও রূপ বসু আগ্রায় বাদশাহ-দরবারে উপস্থিত হন। সেই অবধি তাঁহারা বাদশাহ-দরবারে প্রতাপের অত্যাচারকাহিনী, মোগলশক্তির প্রতি তাঁহার উপেক্ষা প্রভৃতির কথা অতিরঞ্জিতভাবে ক্রমাগত বর্ণনা করিতে থাকেন; অবশেষে সেলিম বাদশাহ হইলে, তাঁহাকেও প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যশোহররাজ্য শাসন করিতেছেন দেখিয়া, প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহকে পুনরায় বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন।

মানসিংহ বঙ্গ-অভিযানের জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। এক বিরাট মোগলবাহিনী, বাইশজন মুসলমান আমীর ও তাহাদের অধীনস্থ অগণিত সৈন্য সহ তিনি প্রতাপ-বিজয়ের জন্য বাংলা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথনির্দ্দেশ ও অন্যান্য গোপনীয় সন্ধান জানাইবার জন্য কচু রায় মানসিংহের সহগমন করিলেন।

মানসিংহ আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন; সেখান হইতে রাজধানী রাজমহলে ও তথা হইতে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া যশোহর-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ বাংলায় উপস্থিত হইলে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আকাশ দিনরাত্র মেঘাবৃত হইয়া রহিল। মুহুর্মুহু বজ্রের গর্জ্জন ও শিলাপাত-

শব্দে বায়ুমণ্ডল প্রতিক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই মহাতুর্য্যোগের মধ্যে মানসিংহ ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন। উত্তালতরঙ্গময় নদীবক্ষে কোথাও একখানা নৌকার চিহ্নমাত্র নাই দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কিরূপে তাঁহার বিশালবাহিনী পরপারে উত্তীর্ণ হইবে, এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। এদিকে সৈন্যদের রসদ ফুরাইয়া আসিল,—এই তুর্য্যোগের মধ্যে দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও কোথাও এককণা খাদ্যদ্রব্য মিলিল না দেখিয়া মানসিংহ প্রমাদ গণিলেন। এমন সময় ভবানন্দ মজুমদার নামক প্রতাপের এক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। এই ব্রাহ্মণ স্বার্থসিদ্ধির আশায় বহু নৌকা ভরিয়া রসদ আনিয়া উপস্থিত করিল এবং মোগলবাহিনীর পার হইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল। এই বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মানসিংহ নির্ব্বিঘ্নে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। মানসিংহ কৃষ্ণনগর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার মধ্য দিয়া ক্রমে সুন্দরবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার বিপুল সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্রমে যমুনা ও ইছামতী পার হইয়া যশোহর রাজধানীর নিকটস্থ মৌতালায় আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

প্রতাপ, মানসিংহের আগমনের সংবাদ পাইয়া, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার জীবন-মরণ সমস্যা,—এই জয়-পরাজয়ের উপর তাঁহার আজন্ম সাধনার সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে! মানসিংহকে পথেই বাধা দিবার জন্য তিনি যমুনা ও ইছামতীর বক্ষে কামানসজ্জিত অসংখ্য রণতরী রক্ষা করিলেন। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে সপ্তাহব্যাপী প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁহার অধিকাংশ রণতরী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইল। আর যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

প্রতাপের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ যুদ্ধের ফল ঘোরতর অমঙ্গলজনক হইবে আশঙ্কায় তাঁহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল। তবুও নির্ব্বাপিতপ্রায় উৎসাহকে আশার ইন্ধনযোগে আবার দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত করিলেন। তিনি স্থলযুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজনে প্রস্তুত হইলেন।

মানসিংহ তাঁহার প্রথা অনুসারে এক দূতের হস্তে একগাছি শৃঙ্খল ও একখানা অসি দিয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ এই প্রতীকের অর্থ বুঝিয়া অধীনতাজ্ঞাপক শৃঙ্খল পদদলিত করিয়া, সমরসূচক অসি চুম্বন করিলেন। ভীষণ রণদানব নাচিয়া উঠিল।

মৌতালার রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী-মোগলে সংহারলীলার প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। প্রতাপের কামানের প্রচণ্ড

গর্জ্জন দিঙ্বধূগণের কর্ণকুহর ভেদ করিয়া তাহাদিগকে মূর্চ্ছাবিষ্ট করিয়া ফেলিল। সূর্য্যকান্ত, মদনমল্ল, প্রতাপদত্ত প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঘোরতর বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজ সেনাপতি রডার অপূর্ব্ব রণ-কৌশল ও অদ্ভুত বীরত্বে মোগল ও রাজপুতের বক্ষরক্ত হিম হইয়া গেল। প্রতাপের মদমত্ত রণহস্তিসমূহের বিশাল পদভরে ও রণোন্মত্ত অশ্বের ক্ষুর-সংঘাতে রণস্থল কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তিন দিন প্রবলবেগে যুদ্ধ চলিল। মোগল আমীরগণ বাঙ্গালী সেনাপতিগণের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষত-বিক্ষত-দেহে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে চির-বিশ্রামের শয্যা পাতিল। মানসিংহ, বাঙ্গালীর এই অদ্ভুত বীরত্বে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। সেই কাবুল-বিজয়ী, উত্তর-ভারত-পদানতকারী ভারতবিশ্রুত-কীর্ত্তি সেনাপতির সমস্ত বীরত্ব-গৌরব আজ বুঝি বাংলায় প্রতাপাদিত্যের নিকট ম্লান হইয়া গেল। মোগল আমীরগণের পতনের পর মানসিংহের সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। মানসিংহ তিন দিনের যুদ্ধে বিন্দুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভীত হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রতাপের উচ্চ জয়বাদ্যে চারিদিক কম্পিত হইল; বাঙ্গালী-সৈন্যগণের বিজয়োল্লাস-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রতাপ জয়মাল্য কণ্ঠে পরিয়া নিজ শিবিরে ফিরিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। মানসিংহ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে শিবিরে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পার্শ্বে, ভবানন্দ মজুমদার, কচু রায় প্রভৃতি

অধোমুখে বসিয়া আছে। পরামর্শ চলিতেছিল—কি করিয়া প্রতাপ-বিজয় সম্ভব হয়। বহুক্ষণ পরামর্শের পর ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বলিল, "প্রতাপ যশোরেশ্বরীর অনুগৃহীত বলিয়া উহার সৈন্যেরা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত উৎসাহ ও মানসিক বল পায়; সেইজন্যই তাহারা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে,—আপনি আগামী কল্যই মহাসমারোহে যশোরেশ্বরীর পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে এই রটনা করিয়া দেন যে, দেবী আপনাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি প্রতাপকে ত্যাগ করিয়া আপনার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা প্রতাপকে জয় করার আর কোন ভাল পন্থা দেখি না।" মানসিংহ ভবানন্দের পরামর্শ অনুসারে প্রত্যূষেই বিপুল সমারোহের সহিত যশোরেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সৈন্যদলে ও সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে, গতকল্য শেষরাত্রে দেবী মানসিংহকে এক স্বপ্ন দেখাইয়াছেন যে, তিনি প্রতাপকে ত্যাগ করিয়াছেন। মানসিংহের সৈন্যগণ এই সংবাদে বিশেষ উৎসাহিত হইল ও আগামী যুদ্ধে ভীষণ আক্রমণে বাঙ্গালীকে জর্জ্জরিত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

প্রতাপের উপাস্যদেবী যশোরেশ্বরী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার বহু প্রবাদ বাংলার নানাপ্রান্তে বৃদ্ধদের মুখে পল্লবিত আকারে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ঘটক-কারিকায় লিখিত আছে, প্রতাপ কোন নীচজাতীয়া রমণীর নির্লজ্জতার জন্য স্তন কাটিয়া ফেলায়, নিজশক্তির অংশস্বরূপা নারীজাতির

লাঞ্ছনা করার জন্য দেবী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অন্য একটি প্রবাদে এইরূপ শুনা যায় যে, দেবী ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে গেলে প্রতাপ তাঁহাকে দুশ্চরিত্রা রমণীজ্ঞানে তাড়াইয়া দেন এবং সেই অছিলায় তিনি প্রতাপকে ছাড়িয়া আসেন। ঘটক-কারিকায় আছে, প্রতাপ প্রভাতে মন্দিরে উপবেশন করিয়া স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ দেখিলেন যে, দেবী দক্ষিণমুখী হইতে পশ্চিমমুখী হইয়াছেন। তারপর তাঁহার সভাপণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতী চণ্ডীপাঠ করিতে গেলে তিনবার তাহা অশুদ্ধ হইয়া গেল। প্রতাপ তখনই বুঝিলেন, দেবী তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মানসিংহ যশোরেশ্বরীর পূজা সমাপন করিয়া, মোগল-সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। আবার কয়েকদিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যকান্ত, মদনমল্ল, রডা প্রভৃতি প্রতাপের প্রধান সেনা-পতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণের পতনে প্রতাপের বোধ হইল যেন তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবুও প্রতাপ অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ কয়জন বিখ্যাত সেনাপতির একযোগে মৃত্যুতে, একটা সন্দেহের অপদেবতা তাঁহার মনের কোণে ছায়াপাত করিল। ভাগ্যের এইরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—কি জানি

মানসিংহের স্বপ্ন বোধ হয় সত্যও হইতে পারে। একদিন তাঁহার উন্নতির স্রোত অব্যাহত ধারায় বহিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ সে স্রোতে ভাটা পড়িয়া একেবারে তাহা চড়ায় শুকাইয়া গেল। প্রতাপের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রমে সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল। অবশেষে মানসিংহের সহিত সম্মুখযুদ্ধে উপস্থিত হইবার শক্তিও তাঁহার লোপ হইল। তিনি নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার আশায়, মানসিংহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির ফলে প্রতাপের সমস্তই ঠিক রহিল—কেবল নিজনামে মুদ্রা প্রচলন বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার এতদিনকার সমস্ত সাধনা, সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা এইরূপ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া, তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে, নিরাশাব্যথিত চিত্তে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

মানসিংহ আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী-পদ ত্যাগ করিলেন। কুতবউদ্দীন কোকতলাশ ও জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ নামক দুই ব্যক্তি সুবাদারের কার্য্য করিবার পর আলাউদ্দিন ইস্‌লাম খাঁ বাংলার সুবাদার হইয়া আসিলেন। ইস্‌লাম খাঁ, পর্ত্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের হস্ত হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার এবং পদ্মা ও মেঘনাতে রণবহর রাখিবার সুবিধার জন্য, দূষিত-জলবায়ু তাণ্ডা ও অসুবিধাজনক রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ সুবাদার হইয়া আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার

জন্য সংবাদ দিলেন। প্রতাপাদিত্য বহু উপঢৌকন সহ ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও এই সময়ে প্রতাপের শক্তি খুব বেশী কমিয়া যায় নাই। একজন সমসাময়িক মুসলমান লেখকের হস্তলিপির অনুবাদ হইতে বর্ত্তমানে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যরূপে জানা গিয়াছে যে, ঐ সময় প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্যে ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে ছিল না। তাঁহার যুদ্ধসরঞ্জামে পূর্ণ সাতশত রণতরী, বিশহাজার পদাতিক সৈন্য ও পনর লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য ছিল। প্রতাপ আর বেশী দিন মোগলের নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সত্য, তাঁহার সাধনার বৃক্ষ কাহার নিদারুণ অভিসম্পাতে আজ বজ্রাহত, তাঁহার আশার উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে,—তবুও তাঁহার সমস্তবাধাবন্ধনদ্বেষী, স্বাধীনতাকামী, অদম্য হৃদয় এখনও শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় নাই। আজ আসন্ন বার্দ্ধক্যের অন্ধকার জীবনপথের দিক্‌চক্রবালে ঘনাইয়া আসিতেছে, আজ পথশ্রান্তি, রৌদ্রবৃষ্টিক্লান্তির অবসানে, সুখনিদ্রার ঘোরে, দুইচোখ বুঁজিয়া আসাই স্বাভাবিক—কিন্তু হৃদয়ে যে তাঁহার এক উজ্জ্বল-গৈরিকধারী, যৌবনদীপ্তিমণ্ডিত, মুক্তিপূজারি বাউল এখনও একতারাতে ঘা দিতেছে! প্রতাপ ভাবিলেন—নিজের বিবেকের কাছে আর অপরাধী না হইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

ইস্‌লাম খাঁ বাংলার জমীদারদিগকে দমন করিবার সংকল্প

করিয়া প্রতাপাদিত্যকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ ইস্‌লাম খাঁর এই অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। ইস্‌লাম খাঁ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে, এনায়েৎ খাঁ ও মীর্জ্জাসহনের নেতৃত্বাধীনে স্থলপথে ও জলপথে বহু মোগলসৈন্য প্রেরণ করিলেন। আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। মোগলসৈন্যগণের আগমন-সংবাদ পাইয়া প্রতাপ তাহাদিগকে বাধা দিবার ও রাজ্য রক্ষার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কমল খোজা, কুমার উদয়াদিত্য, আজমল খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণের অধীনে বহু রণতরী, হস্তিসৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য এবং অগণিত পদাতিক সৈন্য মোগলবাহিনীর গতিরোধ করিবার জন্য ইছামতী ও শালখীর সঙ্গমস্থলে প্রেরণ করিলেন। নিজে ধূমঘাট রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত সৈন্যসহ রাজধানীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইছামতী ও শালখীর মিলনস্থলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জলে ও স্থলে সমানভাবে কয়েকদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বিংশতিবর্ষীয় তরুণ যুবক উদয়াদিত্যের অতুলনীয় বীরত্ব ও অসাধারণ সাহসে মোগলসেনাপতিগণ বিস্মিত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কমল খোজা ও আজমল খাঁ প্রবল বিক্রমে মোগলসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। মোগলসৈন্যের রক্ত-ধারায় রণক্ষেত্রে স্রোত বহিল। এনায়েৎ খাঁ এক প্রকার জয়ের আশা ছাড়িয়া দিলেন—এমন সময় মোগলপক্ষের গোলার আঘাতে কমল খোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কমল খোজার পতনের সংবাদ প্রতাপের সৈন্যদলের মধ্যে প্রচারিত হওয়ামাত্র তাহারা হঠাৎ ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই অবসরে মোগলসৈন্যগণ প্রবল উৎসাহে বাঙ্গালী-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। উদয়াদিত্য ও আজমল খাঁ বহুচেষ্টা করিয়াও আর তাহাদের একত্র করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কোন আশাই নাই দেখিয়া, উদয়াদিত্য ও আজমল খাঁ ক্ষুণ্ণমনে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

কমল খোজার মৃত্যু ও তাঁহার সৈন্যদলের পরাজয়-সংবাদ ধূমঘাটে পৌঁছিলে প্রতাপের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভাবিলেন—এইবার চরম পরাজয়ের গ্লানি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মোগলের চরণতলে লুটাইতে হইবে—জীবনের শেষ কয়টি দিন মণিহারা ফণীর মত নির্জীব, অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। তবুও নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর মত তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হইলেন না—অসীম উৎসাহে বুক বাঁধিয়া তিনি রাজধানী-রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। দুর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি কামান সজ্জিত হইল ও উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মোগলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মোগল-বাহিনী বিজয়োল্লাসে চারিদিক কাঁপাইয়া রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইল। রাজধানীর নিকট তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত প্রতাপ শেষবার জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি অগ্নিময়ী বাণীতে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভীমবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শতচেষ্টা করিয়াও তাঁহার

ভাগ্যের প্রতিকূলস্রোত আর ফিরাইতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার সৈন্যদলে বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিয়া তাঁহার প্রতিকূল ভাগ্যকে আরও প্রতিকূল করিয়া ফেলিল। তিনি আর সম্মুখ-যুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব মনে করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিজয়ী মোগলসেনাপতি দুর্গ ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া রাজধানী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দান্ত মোগলসৈন্যগণ নিরপরাধ অধিবাসীদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল; সমস্ত ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইতে লাগিল; নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার রব উঠিল। অবশেষে বিপন্ন প্রজাবৃন্দের কাতর আর্ত্তনাদ দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়া প্রতাপের কর্ণে পৌঁছিল। তাঁহার প্রিয়তম প্রজাবৃন্দের উপর অমানুষিক অত্যাচারে ও তাহাদের ক্রন্দনের রোলে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য তিনি সমস্ত মান-অপমান তুচ্ছ করিয়া সন্ধি করিতে মনস্থ করিলেন। প্রতাপ কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত এনায়েৎ খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। এনায়েৎ খাঁ সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু বলিলেন যে, সন্ধির চূড়ান্ত কথাবার্ত্তা সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর সহিতই হইবে, কারণ তিনি সুবাদারের অধীনে একজন সেনাপতি মাত্র এবং এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি

নিজের স্কন্ধে লইতে সাহসী নন। অগত্যা প্রতাপ সন্ধি করিবার জন্য ঢাকায় ইস্‌লাম খাঁর নিকট যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রতাপ এনায়েৎ খাঁর সহিত নৌকারোহণে ঢাকা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকায় চড়িয়া তাঁহার পরমারাধ্যা দেশ-মাতৃকার স্নেহ-ঢলঢল শ্যামল মুখচ্ছবির পানে একবার তাকাইয়া তাঁহার দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; এই গরীয়সী জননীকে চিরকালের মত শৃঙ্খলিত করিবার জন্য তাঁহার এক বিশ্বাসঘাতক সন্তান আজ দূরদেশে যাত্রা করিতেছে! ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আজ মোগলের পদলেহন করিয়া স্বাধীনতার বিনিময়ে শুধু জীবনভিক্ষা করার মর্ম্মান্তিক অপমান হইতে মৃত্যু ভিন্ন আর কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আজ যশোহর হইতে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি আলোড়িত হইয়া তাঁহার চোখে অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিল। আজীবন সাধনার চরম সার্থকতায় তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে একটা অগাধ তৃপ্তি ও সফলতার আলোকে উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্যময় ও মধুময় হইয়া উঠিল না—তাঁহার বড় সাধের, নিজ হাতে-গড়া যশোহররাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল —এই বোধ হয় যশোহর হইতে তাঁহার শেষ বিদায়। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হে ভগবান, তাই হোক্, তাই হোক্—শত্রুর পায়ে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া হীন মুক্তি ক্রয় করিয়া যশোহরে আসিয়া আর যেন মুখ দেখাইতে না হয়।"

ঢাকায় পৌঁছিয়া প্রতাপ ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এনায়েৎ খাঁর নিকট প্রতাপের সামরিক বল, যুদ্ধকৌশল ও বীরত্বের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে অতি প্রবল শত্রু মনে করিয়া, ইস্‌লাম খাঁ সন্ধি করিতে অসম্মত হইলেন ও প্রতাপকে শৃঙ্খলিত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। যশোহররাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইল।

প্রতাপের মোগল-কারাগারে বন্দী হওয়ার সংবাদ যশোহরে পৌঁছিলে, বিষাদের গভীর ছায়ায় রাজধানী ম্লান হইয়া গেল, —রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতাপের বীরপুত্র উদয়াদিত্য মোগলের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধে, ক্ষোভে ও বৈরনির্য্যাতনস্পৃহায় উন্মত্তবৎ হইয়া মোগলসৈন্য-দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাণী শরৎকুমারী কিছুতেই পুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া একাকী অগণিত মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হওয়া মৃত্যুর নামান্তর মাত্র,—তবুও বীরজননীর মত তিনি চোখের জল চাপিয়া বীরপুত্রকে স্বহস্তে রণ-সাজে সজ্জিত করিলেন। স্নেহের তুলাল, একমাত্র পুত্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ছাড়িয়া দিতে তাঁহার হৃদয় তুরু-তুরু কাঁপিয়া উঠিল,—কিন্তু তিনি সমস্ত ব্যাকুলতা মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া তাহার যুদ্ধযাত্রার পথ শত অকথিত আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

সিংহশিশু সিংহবিক্রমে শত্রুসৈন্যের উপর পতিত হইল। কুশলীর রণক্ষেত্রে আবার এক মহাযুদ্ধের অভিনয় হইল। উদয়াদিত্যের অসামান্য বীরত্বে রণভূমি মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বহু মোগলসৈন্য ধ্বংস করিয়া সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত উদয়াদিত্য বীরোচিত শয্যায় চিরদিনের জন্য শয়ন করিলেন।

উদয়াদিত্যের মৃত্যু-সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে উচ্চ আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রাণী নিদারুণ পুত্রশোকে ক্ষণকাল আত্মহারা হইয়া পড়িলেন,—কিন্তু পরক্ষণেই অসীম ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া, নিজেকে ও অন্তঃপুরচারিণীদিগকে মোগলের অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এখনই মোগলসৈন্যগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অসহায়া রমণীদের প্রতি অত্যাচার করিবে—এই মনে করিয়া শরৎকুমারী ক্ষিপ্রতার সহিত অন্তঃপুরিকা ও শিশুদের লইয়া এক নৌকায় আরোহণ করিয়া পুরীর পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। পরক্ষণেই বিজয়োন্মত্ত মোগলসৈন্যগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। তাহাদের বিকট উল্লাসধ্বনিতে আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত হইয়া গেল; ক্ষিপ্ত মোগলসৈন্যদের লুটপাট ও উচ্চ কলরবের মধ্যে শরৎকুমারী বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সত্বরই মুসলমান সৈন্যগণ তাঁহার নৌকা চিনিতে পারিয়া, মহা কোলাহলের সহিত উহা ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

শরৎকুমারী নির্ভীকভাবে নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন —তারপর ভৃত্যকে নৌকার তলদেশ কুঠারের আঘাতে ছিন্ন করিতে আদেশ দিলেন। ভৃত্য একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল—কিন্তু সেই অচঞ্চল পাষাণ-প্রতিমার দৃঢ়সংবদ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া তাহার কোন কথা বলিবার সাহস হইল না। সে নীরবে রাণীর আদেশ পালন করিল। দেখিতে দেখিতে তরণী আরোহী সহ অতল জলে ডুবিয়া গেল।

এদিকে প্রতাপ কিছুদিন ঢাকায় মোগল-কারাগারে অবস্থান করিলেন,—তারপর তাঁহাকে লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া আগ্রায় সম্রাট্-দরবারে পাঠান হইল। পথে কাশীধামে পৌঁছিলে, বিশ্বেশ্বর তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিলেন। বাংলার এই প্রাতঃস্মরণীয় বীর কাশীধামে দেহত্যাগ করিলেন।

রাজা সীতারাম রায়

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বর্ত্তমান যশোহর জেলায়, মধুমতীতীরে, হরিহরনগর গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীরামদাস সুবাদারের খাস সেরেস্তায় হিসাব-বিভাগে কার্য্য করিতেন। ক্রমে শ্রীরামদাস অত্যন্ত বিশ্বাসী হওয়ায়, মানসিংহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "খাস বিশ্বাস" উপাধি দান করেন। তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজসরকারে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া ঢাকায় আসিলে, তিনিও ঢাকায় যান। ঢাকায় তিনি বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে নবাব কর্ত্তৃক 'রায়' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার পুত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার তহশীলদার নিযুক্ত হন এবং কিছু জোত ও তালুক ক্রয় করিয়া ভূষণার নিকট হরিহরনগরে বাস করিতে থাকেন। এই উদয়নারায়ণই সীতারামের পিতা। সীতারাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। সীতারামের মাতার নাম দয়াময়ী। দয়াময়ী অত্যন্ত তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। একবার তাঁহার পিত্রালয়ে দ্বিপ্রহর রাত্রে ডাকাইত পড়ে। তখন তিনি সেখানে বাস করিতেছিলেন। বাড়ীর পুরুষেরা ডাকাইতদলের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না

দেখিয়া, তিনি এক খড়্গাহস্তে দস্যুদিগকে আক্রমণ করেন। এক আলুথালুবেশা, মুক্তকেশী নারীকে এইরূপ রণরঙ্গিণী কালিকা-মূর্ত্তিতে হঠাৎ ভীষণ খড়্গাহস্তে আক্রমণ করিতে দেখিয়া দস্যুদল ভীত হইয়া পলায়ন করে। এই বীরনারীর শোণিত সীতারামের ধমনীতে সঞ্চালিত হওয়ায় ও তাঁহারই স্তন্যধারায় বর্দ্ধিত হওয়ায় সীতারাম শৈশব হইতেই অসাধারণ সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাল্যকালে সীতারামের লেখাপড়ার দিকে বিশেষ কোন ঝোঁক ছিল না। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও পার্শী শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন বা জ্ঞানার্জ্জনই জীবনের ব্রত করিবেন, এরূপ কোন কল্পনা কোন দিনই তাঁহার মনে আসে নাই। বাল্যকালে শরীরচর্চ্চার দিকেই তাঁহার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি মল্লক্রীড়া, অসি-চালনা, লাঠিখেলা প্রভৃতিতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। মহারাষ্ট্রনায়ক শিবাজী ও ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের সাথে এইখানে তাঁহার বিশেষ সাদৃশ দেখা যায়। শিবাজী যেমন বাল্যকালে বন্ধুর পর্ব্বতশিখরে দিবারাত্র অশ্বারোহণে বেড়াইতেন, নেপোলিয়ান যেমন সহপাঠীদের সহিত পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা না করিয়া কৃত্রিম রণাভিনয়ে ব্যস্ত থাকিতেন, সীতারামও সেইরূপ, শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া, শারীরিক শক্তি, সাহস ও কৌশলবর্দ্ধক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, এক দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক-জীবনের ভিত্তি রচনা

করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সীতারামের বৈষয়িক কর্ম্মেও বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি, শ্যামনগর প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে তাঁহার যে ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য প্রায়ই অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন ও প্রায় সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

সীতারাম যৌবনে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণ মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুর অত্যাচারে ভীষণ-ভাবে নির্য্যাতিত হইতেছে। পাঠান চোরদস্যুও দেশের মধ্যে একটা ঘোরতর অত্যাচারের অবতারণা করিতেছে। লোক ধনপ্রাণ লইয়া সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। পথিক নির্ভয়ে পথ চলিতে পারে না, গৃহী রাত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে না, অর্থাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে পারে না। চারিদিকে যেন একটা প্রবল অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সীতারাম ভাবিলেন—মানুষ হইয়া, সভ্য-সমাজে বাস করিয়া, যদি কোন অসুবিধার প্রতীকার করিতে না পারিয়া তিলে তিলে তাহার পেষণে মরিতে হয়, তবে সে জীবনধারণ ত বিড়ম্বনা মাত্র—সে পরাজয় পশুত্বের পরিচায়ক ও মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী। সীতারাম, দেশবাসীকে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য, যৌবনের সমস্ত শক্তি, উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুদের লইয়া এক স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত

করিলেন। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের সম্মুখীন হইতে হইলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া দরকার মনে করিয়া, সীতারাম যুবকদিগকে লাঠিখেলা ও তরবারি-চালনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সীতারাম লাঠিখেলায় ও অসি-চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন,—তাঁহার পরিচালনে স্বেচ্ছাসেবকদল শীঘ্রই অসীম শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তিনি এই যুবকদল লইয়া দস্যুদলনে নিযুক্ত হইলেন। এই স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত সুকঠিন কার্য্যে তাঁহার যৌবনের মনোরম দিনগুলি অতি ভীষণ কঠোরতার মধ্য দিয়া কাটিতে লাগিল। তিনি যৌবনোচিত বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিলেন, আমোদ-বিশ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এমন কি আহার-নিদ্রারও কোন নিয়মিত সময় রহিল না—কেবল রাত্রিদিন নানাস্থানে দস্যুর পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও তিনি নদীপথে নৌকার উপরই নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন, —কখনও বা অন্ধকার রাত্রিতে ক্রোশের পর ক্রোশ দস্যুর পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের ঠাণ্ডা—সমস্ত সহ্য করিয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, পদে পদে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তিনি দস্যুগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার সুবাদার। ঢাকা তাঁহার রাজধানী। তিনি যশোহর-অঞ্চলে দস্যুতস্করের অত্যাচার দমন করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াও ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে

পারেন নাই। সীতারাম এই কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া, সায়েস্তা খাঁ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঢাকায় আহ্বান করিলেন। সীতারাম আরও কয়েকবার কর্ম্মব্যপদেশে ঢাকা গিয়াছিলেন—এবার ঢাকা যাইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব সীতরামের বলিষ্ঠ দেহ ও তেজস্বী স্বভাব দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার উপর দক্ষিণবঙ্গের দস্যুদমনের ভার দিলেন এবং তাঁহার এই কার্য্যে যথোপযুক্ত সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাদশাহের নিকট সাহায্য পাইয়া সীতারাম অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইলেন এবং দেশবাসীকে চিরকালের মত এই অশান্তি হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। করিম খাঁ নামক একজন পাঠান তখন দক্ষিণবঙ্গে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল। তাহার পীড়নে প্রজাবৃন্দ ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছিল। বাদশাহী সৈন্যের সহিত তাহার বহুবার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে দমন করা যায় নাই,—বরং তাহার অত্যাচার আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। সীতারাম অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করিয়া, নিজের দলবল ও নবাবের সৈন্য লইয়া, সুযোগমত একবার করিম খাঁকে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। আরও কয়েকবার স্থানে স্থানে তাহাকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাহাকে দক্ষিণবঙ্গ হইতে চিরকালের মত বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে দেশ মুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে সীতারামের যশোগানে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। নবাব তাঁহার বীরত্বে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নলদী পরগণা জায়গীর-স্বরূপ দান করিলেন। দেশ আবার শান্তি ও সমৃদ্ধির আলোকে হাসিয়া উঠিল। দেশবাসীরা নিরুদ্বেগচিত্তে বাস করিতে লাগিল এবং সীতারামকে অজস্র ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সীতারামের নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

দক্ষিণবঙ্গে বাদশাহের বারজন কর-সংগ্রাহক ছিল। তাহারা নিয়মিতরূপে রাজসরকারে কর পাঠাইত না এবং একপ্রকার স্বাধীনভাবে কার্য্য করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শেষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া বাদশাহের বিপক্ষাচরণ করিতে লাগিল। নবাব সীতারামের বীরত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন,—তিনি সীতারামের উপর বিদ্রোহদমনের ভার দিলেন। সীতারাম, বহু চেষ্টার পর এই বিদ্রোহ দমন করিয়া নবাব-সরকারে নিয়মিত কর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কথা দিল্লীতে বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। বাদশাহ তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সীতারামের রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সেই সময়ে দক্ষিণবঙ্গের জমীদারগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও দস্যুদলনের কথা সকলের

মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। জনসাধারণের অগাধ প্রীতি, প্রচুর অর্থ ও বিস্তৃত রাজ্য তাঁহাকে শীঘ্রই অশেষ প্রতিষ্ঠাশালী করিয়া তুলিল। নবাব তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বাদশাহের অনুমতি অনুসারে সীতারামকে 'রাজা' উপাধি দান করিলেন ও দক্ষিণবঙ্গের অরণ্যাবৃত বিশাল ভূমিখণ্ডের অবাধ অধিকার প্রদান করিলেন। সীতারাম মহাসমারোহের সহিত অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন করিয়া রাজোপাধি ধারণ করিলেন।

সীতারাম 'রাজা' হইয়া উপযুক্ত একটি রাজধানী স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটি স্থান নির্ব্বাচিত হইল। সীতারাম সেই স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া নগর পত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে মহম্মদ খাঁ নামে একজন মুসলমান ফকির বহুদিন হইতে বাস করিত। প্রজাবৎসল সীতারাম তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার না করিয়া তাহারই নামে নগরের নাম রাখিলেন—মহম্মদপুর। এই মহম্মদপুরেই তিনি তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন।

মহম্মদপুরে রাজধানীস্থাপনের পর সীতারাম অক্লান্ত পরিশ্রমে উহাকে সমৃদ্ধিশালী ও সর্ব্বপ্রকারে রাজধানীর উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক চতুষ্কোণ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইল; একক্রোশব্যাপী সুদীর্ঘ ও সুগভীর পরিখা খনিত হইল; রাজধানীর মধ্যে বহু সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল। তিনি রাজধানীর মধ্যে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিলেন। দুর্গ-তোরণের নিকট এক অতি বৃহৎ সরোবর খনন

করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—রামসাগর। এই বিশাল সরোবর উত্তর দক্ষিণে ১৫০০ হাত দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০ হাত প্রশস্ত। নগরের মধ্যে সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর নামে আরও বহু দীর্ঘিকা খনিত হইল। স্থানে স্থানে সুদৃশ্য দেবমন্দির নির্ম্মিত হইল ও তাহার মধ্যে তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সীতারাম বিপুল সমারোহের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল ছিল যে, এই লক্ষ্মীনারায়ণই তাঁহার উন্নতির মূল। লক্ষ্মীনারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত যে, সীতারাম অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার সময়, একদিন হঠাৎ তাঁহার অশ্বের ক্ষুর মাটিতে গাড়িয়া গিয়া অশ্ব অচল হইয়া পড়ে। সীতারাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বের পদ উদ্ধার করিয়া দেখিলেন যে, তাহার নীচে একটি দেবমন্দির দেখা যাইতেছে। পরে নিম্নে খনন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ বাহির করিলেন। এই বিগ্রহপ্রাপ্তির পরই সীতারামের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। সীতারাম মহম্মদপুরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিবার জন্য স্থানে স্থানে পুষ্পোদ্যান রচনা করিলেন। কোথাও পথপার্শ্বে সাধারণের বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য উদ্যানশোভিত বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হইল। এইরূপে মহম্মদপুর অল্পদিনের মধ্যেই অশেষ-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত এক বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

রাজধানীর বাহ্যিক উন্নতি সাধন করিয়া সীতারাম তাহার আভ্যন্তরিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বাংলার

নানাপ্রান্ত হইতে বিবিধশিল্পবিদ্যাকুশল লোকদিগকে সাগ্রহে লইয়া আসিয়া মহম্মদপুরে স্থাপিত করিলেন। কেহ বা বয়ন-শিল্পের কারখানা খুলিয়া নানাবিধ বস্ত্রবয়ন আরম্ভ করিল; কেহ বা মৃৎশিল্পের কার্য্যে ব্যস্ত রহিল; কেহ বা নানাবিধ তৈজসপত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। মহম্মদপুরের বাজার এক বৃহৎ শিল্পপ্রদর্শনীতে পরিণত হইল। শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য শীঘ্রই মহম্মদপুরের নাম চারিদিকে খ্যাত হইয়া পড়িল। সীতারাম নিজ রাজধানীতে বিখ্যাত কর্ম্মকারগণের দ্বারা কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। 'জাহানকোষ'-নির্ম্মাতা জনার্দ্দনের মত বহু সুদক্ষ কর্ম্মকার ঢাকা হইতে মহম্মদপুরে আসিয়া তাঁহার জন্য কামান-বন্দুক নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

রাজধানী সুদৃশ্য ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া সীতারাম রাজ্যের প্রজাবৃন্দের উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিলেন। নানাস্থান হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। যশোহর-খুলনা অঞ্চলে বাসের উপযুক্ত স্থানসকল ক্রমেই পূর্ণ হওয়ায় অবশেষে তিনি তাঁহার রাজ্যের জঙ্গলাবৃত স্থানসমূহের জঙ্গল কাটাইয়া ক্রমাগত প্রজাপত্তন করিতে লাগিলেন। সীতারামের সুশাসন ও দস্যুদলনের কথা শুনিয়া, লোকে নিরুপদ্রবে ও সুখশান্তিতে বাস করিবার আশায় সীতারামের রাজ্যে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের বাসস্থান ও প্রচুর আবাদী জমী দিয়া নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত

করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সীতারামের এক ধনজনপূর্ণ বিশাল রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিল। সীতারামের সুশাসন ও প্রজাবৎসলতায় তাঁহার প্রজাবৃন্দ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়া ও বহু আবাদী জমীর উপস্বত্ব ভোগ করিয়া পরম আনন্দের সহিত দিনপাত করিতে লাগিল। এদিকে প্রজাবৃন্দের জলকষ্ট নিবারণের জন্য সীতারাম রাজ্যের বহুস্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সীতারামের সঙ্গে বাইশশত কোদালী থাকিত। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন, সে পথেই পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে যাইতেন এবং নিত্য নূতন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেন। এই জনপ্রবাদ হয়ত অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মূলে যে তাঁহার জলদানপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আজও যশোহর-খুলনা অঞ্চলে সীতারামের বহু জলাশয়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সীতারাম তাঁহার রাজ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও প্রভূত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু স্থানে তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপকদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রচুর ভূমি-বৃত্তি দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিলেন। এখনও পণ্ডিতগণের বংশধরগণ কেহ কেহ সীতারামপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন। সীতারাম তাঁহার মুসলমান প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্যও বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বহু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া

মৌলবীদিগকেও ভূমি-বৃত্তি দান করিলেন। সীতারামের আন্তরিক উৎসাহ ও চেষ্টায় তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রজাবৃন্দের শিক্ষার পথ অত্যন্ত সুগম হইয়া গেল। এইরূপে সীতারামের প্রজাবৃন্দ অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও শিক্ষা-সঙ্কট হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া রামরাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

আরংজেব, তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে, বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণরূপে হইতেছে না দেখিয়া, তাঁহার পৌত্র আজিম ওশ্বানকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। আজিমের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার দেওয়ান হইয়া আসিলেন। আজিম ওশ্বান ও মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলায় আসিয়া, ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসনের আয়োজন করিলেন। মুর্শিদকুলী রাজস্ববিভাগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাংলাদেশ ১৩ চাক্‌লায় বিভক্ত করিয়া, উহার মধ্যে ১৬৬০টি পরগণা স্থাপন করিলেন এবং বার্ষিক ১৪২৮৮১৮৬ টাকা রাজকর নির্দ্ধারণ করিলেন। এই রাজকর আদায় করিবার জন্য চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইল। এই সমস্ত ফৌজদারের অধীনে চাক্‌লায় চাক্‌লায় সৈন্য থাকিত। মুর্শিদকুলী খাঁ এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, জমীদারগণ নির্ব্বিবাদে রাজকর না দিলে, একের রাজ্য অন্যের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।

আজিম ওশ্বান কিছুকাল বাংলার সুবাদার থাকার পর, মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত তাঁহার ঘোরতর মনোমালিন্য হইল।

তাহার ফলে আজিম ওশ্বান মুর্শিদকুলী খাঁকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ অত্যন্ত নির্ভীক পুরুষ ছিলেন,—তাঁহার নির্ভীকতায় আততায়ীরা পলায়ন করিল। তিনি তাঁহার সেরেস্তা, কাগজপত্র ইত্যাদি লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। সম্রাট্ বিরক্ত হইয়া আজিম ওশ্বানকে কর্ম্ম-ত্যাগ করাইয়া দিল্লীতে লইয়া গেলেন।

আজিম ওশ্বানের পরে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নবাব হইলেন। তিনি ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া গেলেন। মুর্শিদকুলী নবাব হইয়া নিদারুণ কঠোরতার সহিত রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি শুভ পুণ্যাহ নামে এক নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। বৈশাখ মাসে মুর্শিদাবাদে যাইয়া জমীদারদিগকে তাহাদের সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিয়া আসিতে হইবে, না হইলে আগামী বৎসরের জন্য তাহারা জমীদারীর মালিক হইতে পারিবে না এবং কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। রাজকর বাকী পড়িলে, এক দুর্গন্ধপূর্ণ, নরকতুল্য গৃহে জমীদারদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইতে লাগিল,—ঐ গৃহের নাম রাখা হইল বৈকুণ্ঠ,—খাজানা বাকী পড়িলেই বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বাংলার জমীদারমহলে এক বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। বহু জমীদার নির্য্যাতিত হইতে লাগিল—কত রাজপ্রাসাদে হাহাকারধ্বনি উঠিল—কত সুসজ্জিত নগর শ্মশানে পরিণত হইল।

এই গোলযোগের মধ্যে সীতারাম মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া এক বিশাল রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। মোগলরাজশক্তির সেদিকে বিশেষ কোন দৃষ্টিই পড়ে নাই। সীতারাম এখন এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর, প্রভূত অর্থে তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ,—কামান-বন্দুক, অস্ত্র-শস্ত্র ও অগণিত সৈন্যে তাঁহার সামরিক শক্তি এখন দৃঢ়-ভিত্তির উপর স্থাপিত,—প্রজাগণ তাঁহার অনুরক্ত—রাজ্যমধ্যে চারিদিকে শান্তি, ঐশ্বর্য্যও প্রচুর। সীতারাম বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। এখন সমস্ত মোগলসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। স্বাধীনতার ভীষণ মোহ কিছুতেই তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই সময়ের রাজ-নৈতিক অবস্থাও কতকপরিমাণে তাঁহাকে স্বাধীনতা-ঘোষণায় উৎসাহিত করিল। আরংজেবের মৃত্যুর পর মোগলসাম্রাজ্যের একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সিংহাসনলাভের জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে একটা ঘোরতর বিবাদের পর হীনশক্তি বাহাদুর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্ব্বলতায় বাংলার নবাবেরও অনেক পরিমাণে বলহানি হইয়াছে। তাহার উপর মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে বাংলার বহু জমীদার মনে মনে একটা ঘোরতর বিদ্রোহের ভাব পোষণ করিতেছে,—বাহ্যতঃ বিশেষ কিছু প্রকাশ না করিলেও, তাহারা শুষ্ক তৃণের মত অগ্নিসংযোগের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

সীতারাম, এই সমস্ত অনুকূল অবস্থা বিবেচনা কারয়া, এতদিনকার মনোমন্দিরে নিভৃতে পূজিত, সেই স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে বাহিরে স্থাপন করিয়া, সহস্র চক্ষুর সম্মুখে, মহাসমারোহে, মহার্ঘ-উপহারে, পূজা করিতে অগ্রসর হইলেন।

সীতারাম নিয়মিত সময়ে রাজকর পাঠাইলেন না। তাগিদ আসিল;—তিনি তাহা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিলেন। ভূষণার ফৌজদার বহু ভৎর্সনা করিয়া এক কর্ম্মচারীর নিকট এক পত্র দিয়া তাহাকে সীতারামের নিকট পাঠাইলেন। কর্ম্মচারী সীতারামের নিকট আসিয়া বাকী খাজানার জন্য তাঁহাকে অজস্র কটূক্তি করিতে লাগিল। সীতারাম উত্তেজিত হইয়া ফৌজদারকে আর এক কপর্দ্দকও খাজানা দিবেন না বলিয়া, কর্ম্মচারীকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। সীতারাম পূর্ব্বে সহযোগী ছিলেন, এখন পূর্ণ অসহযোগ ঘোষণা করিলেন।

সীতারামের স্পর্দ্ধা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া ফৌজদার তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল লইয়া তিনি সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সীতারাম পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন,—তিনিও ভীমবেগে ফৌজদারকে বাধা দিলেন। সীতারামের সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট ফৌজদারের সৈন্যদল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। এক ভীষণ যুদ্ধের অবসানে, ফৌজদার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়ী সীতারামের বিজয়ধ্বনি মধুমতীর জলকল্লোলের সহিত

মিশিয়া সুদূর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সীতারাম ভূষণা দখল করিয়া তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

সীতারামের সহিত একত্রে যাঁহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা-সৌধের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহারা সীতারামের একদল অন্তরঙ্গ বন্ধু। যখন দস্যুদলন-সংকল্প লইয়া সীতারাম প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার বীরত্বে ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণে একদল উৎসাহী, কর্ম্মী যুবক তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া কার্য্যের প্রচুর সহায়তা করেন। ক্রমে হৃদয়ের বিনিময় হইলে সীতারামের সহিত তাঁহাদের অগাধ বন্ধুত্ব হয়। তারপর যখন সীতারাম রাজা হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে তিনি নিজরাজ্যে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা সীতারামের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া মন্ত্রণার দ্বারা, বীরত্বের দ্বারা, স্বার্থত্যাগের দ্বারা, তাঁহার উন্নতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বাধীনতার স্পৃহাকে উদ্দীপিত করিয়া, উহাকে ভাবপ্রবণতার বায়ুস্তর হইতে নামাইয়া আনিয়া স্বাভাবিক, সঙ্গত এবং ব্যবহারিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এই বন্ধুসঙ্ঘের মধ্যে মোনাহাতীই ছিলেন সর্ব্ব-প্রধান। মোনাহাতীর প্রকৃত নাম রামরূপ। তাঁহার বিশাল, বলিষ্ঠ দেহ, অসাধারণ শারীরিক বল, লৌহকঠিন মাংসপেশী ও তৎসঙ্গে অনুদ্ধত ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে এক ক্ষুদ্র হস্তী-বিশেষ মনে করিয়া মোনাহাতী বলিয়া ডাকিত। তিনি শুদ্ধাচার-

সম্পন্ন ও ভগবৎপরায়ণ ছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক ও দেশ-মাতৃকার ভাবগদ্‌গদ পূজারি ছিলেন। সেই অকৃতদার, সংসার-বিমুখ যুবক, নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর মত সমস্ত কার্য্যই কর্ত্তব্য বোধে করিয়া গিয়াছেন,—সংসারে তাঁহার আসক্তির কোন বন্ধনই ছিল না। তিনি সমস্তদিন দুর্গমধ্যে সৈন্যগণের রণশিক্ষা দিয়া দিনান্তে একমুষ্টি হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া রাত্রে সিংহদ্বারে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতেন। তাঁহার এই অমানুষিক নির্ভীকতা ও সংসারের কোন আপদ-বিপদকেই গ্রাহ্য না করিতে দেখিয়া লোকে বলিত—মোনাহাতী অমর। মোনাহাতীই সীতারামের প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন। বক্তার খাঁ পূর্ব্বে একজন ভীষণ দস্যু ছিলেন, কিন্তু সীতারামের নিকট পরাজিত হন। পরে সীতারামের সংস্রবে আসিয়া, তাঁহার মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার একজন গুণগ্রাহী বন্ধুরূপে পরিণত হন। তিনি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সীতারামের সৈন্যদলে কার্য্যগ্রহণ করেন এবং বন্ধুর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেন। মুচরাসিংহ, গবর দালান, মুনিরাম প্রভৃতিও নিজের প্রাণবিনিময়ে সীতারামকে দুঃখবিপদে পক্ষিণীর মত পাখার আড়াল করিয়া রাখিতে সর্ব্বদা উদ্যত ছিলেন। সীতারাম এই বন্ধুবর্গের সাহায্য-রথে আরোহণ করিয়া উন্নতির আকাশে ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়াছিলেন।

ভূষণার ফৌজদারের পরাজয় ও সীতারামের ভূষণা-অধিকারের সংবাদ বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট

পৌঁছিলে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মুর্শিদ বুঝিলেন যে, সীতারাম মোগলের চক্ষে ধূলি দিয়া এমন শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন যে, তাঁহাকে সহজে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন। নবাব হঠাৎ এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। ভূষ্‌ণা-দখলের পর, সীতারামের নাম দিল্লীতে বাদশাহ-দরবারে বিশেষ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। তখন আবুতোরাপ নামে একজন মোগলসেনাপতি ভূষ্‌ণার ফৌজদারের সনন্দ লইয়া সীতারামকে দমন করিবার জন্য বাংলায় উপস্থিত হইলেন। আবুতোরাপ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া, মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট সনন্দ দাখিল করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য উপযুক্ত সৈন্যসাহায্য চাহিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ তখন পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহদলনে ব্যস্ত ছিলেন—তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই তথায় ব্যাপৃত ছিল। এদিকে জমীদারদিগকে একেবারে হীনবীর্য্য করিয়া, অধিক সৈন্য রাখা অনাবশ্যক জ্ঞানে মুর্শিদ বহুলপরিমাণে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়াছিলেন। তিনি আবুতোরাপকে বেশী সৈন্য সাহায্য করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে যাহা সৈন্য ছিল, তাহাই লইয়া আবুতোরাপ ভূষ্‌ণা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সীতারামের গুপ্তচর সর্ব্বদাই দেশমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। সীতারাম মোগলসেনাপতির অভিযানের সংবাদ পাইবামাত্র আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য বিপুল উৎসাহে যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। মহম্মদপুরে দুর্গরক্ষার জন্য একদল সৈন্য মোনাহাতীর অধীনে রাখিয়া,

সীতারাম সসৈন্যে মধুমতী পার হইয়া ভূষ্‌ণায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্রুতবেগে ভূষ্‌ণাকে সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। মধুমতীর তীরে কামানশ্রেণী সজ্জিত করা হইল। প্রবেশপথসমূহে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা পাহারা দেওয়া হইতে লাগিল। যথাসময়ে আবুতোরাপ মোগলবাহিনী সহ ভূষ্‌ণায় উপস্থিত হইয়া ভীমবেগে সীতারামকে আক্রমণ করিলেন। সীতারাম সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কামানশ্রেণীর গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে মধুমতীর উভয়তীর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সীতারামের সেনাপতিগণ উন্মত্তের মত মোগলসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল। শোণিতস্রোতে মধুমতীর শুভ্রবক্ষ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কিছুদিনের যুদ্ধের পর সমস্ত মোগলসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। আবুতোরাপ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সীতারাম, হিন্দুবীরের উপযুক্ত উদারতার সহিত, আবুতোরাপের মৃতদেহ মহম্মদপুরে আনাইয়া মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী সমাহিত করিলেন।

আবুতোরাপের পরাজয় ও মৃত্যু-সংবাদে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইতে লাগিল—সীতারামকে বোধ হয় আর বাদশাহের বশ্যতাস্বীকার করান যাইবে না। মোগলশক্তির এইরূপ অপমানে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সীতারামকে পরাজিত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাদশাহের অনুমতি লইয়া তিনি হাসান আলি নামক একজন মুসলমানকে ভূষ্‌ণার্ ফৌজদার নিযুক্ত

করিলেন। নাটোররাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রায় রঘুনন্দন তখন নবাবের দেওয়ান। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীবন তখন নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, রামজীবনের পরামর্শমত সমস্ত জমীদারের উপর এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, যদি কোন জমীদার সীতারামকে কোনও প্রকারে সাহায্য করে, তবে তাহার জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইবে ও তাহাকে কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যদি কোন জমীদারের জমীদারী হইতে সীতারাম সৈন্য-সাহায্য বা খাদ্য-সাহায্য পায়, এমন কি যদি কাহারও রাজ্যের মধ্য দিয়া সীতারামের সৈন্য অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করে, তবে তাহাকেও শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ঘোরতর অত্যাচারী মুর্শিদকুলী খাঁর এই আদেশ-পত্রে জমীদারদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাহারা বাধ্য হইয়া সে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল। সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন হইতে লাগিল। দয়ারাম নামে রামজীবনের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিল। সে অত্যন্ত সাহসী ও বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। রামজীবন, তাঁহার নিজের সৈন্যদল ও অন্যান্য জমীদার-দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সৈন্যদ্বারা গঠিত সৈন্যদলের নেতৃত্বভার দয়ারামের উপর দিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া দয়ারামের উপর জমীদারী-সৈন্যের নেতৃত্বভার প্রদান করিলেন। সুবাদারী-সৈন্য পরিচালনের ভার দেওয়া হইল, সংগ্রামসিংহ নামক এক রাজপুত সেনাপতির

উপর। দয়ারাম ও সংগ্রামসিংহের অধীনে বিপুল মোগলসৈন্য দিয়া নবাব, ফৌজদার হাসান আলি খাঁকে ভূষণায় পাঠাইলেন।

আবুতোরাপের পরাজয়ের পরই সীতারাম বুঝিয়াছিলেন যে, এইবার তাঁহার চরম পরীক্ষা উপস্থিত। এইবারের যুদ্ধের ফলাফলের উপর তাঁহার নবগঠিত রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। হয় তাঁহার এই রাজ্য বাংলার একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য হইবে—না হয় বর্ষণক্ষান্ত আকাশের ইন্দ্রধনুর মত ইহা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইবে। তিনি বিপুল উৎসাহে তাঁহার সৈন্যবল, অর্থবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ভূষণা সুরক্ষিত করিয়া তিনি নিজে ভূষণায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহম্মদপুর শাসনের ভার তিনি মোনাহাতীর উপর ন্যস্ত করিলেন। উভয় স্থানেই সৈন্যগণের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ইহার পর সীতারামের এক কঠোর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। যে সমস্ত জমীদার তাঁহাকে স্বাধীনতা-সমরে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই মুর্শিদকুলী খাঁর ফতোয়ায় ভীত হইয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, সীতারামের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিলেন। এই বিপদসঙ্কুল যাত্রায় যাহাদিগকে তিনি সহযাত্রী মনে করিয়াছিলেন—তাহারা সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। যাহারা সে পথের আলোকস্তম্ভে দীপ জ্বালিয়া তাঁহার পথ-চলা অতি সহজ করিয়া দিবে বলিয়াছিল, তাহারাই বিশ্বাস-

ঘাতকতা করিয়া পথের সমস্ত আলো নিবাইয়া দিল। পথ দুর্গম—তবুও তাঁহাকে চলিতে হইবে। উদ্দেশ্য তাঁহার সিদ্ধির মুকুট পরিবে কিনা জানা নাই, তবুও সে পথ-চলাই যে তাঁহার পরম সত্য। নবাবের আদেশে সীতারামের রাজ্যে পণ্যদ্রব্য আমদানী বন্ধ হইয়া গেল। পদ্মা, মধুমতী, জলঙ্গী প্রভৃতি নদী দিয়া যে সমস্ত দ্রব্য সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে সীতারামের রাজত্বে আসিত—তাহা আর আসিতে পারিল না। এইরূপ সঙ্কটেও সীতারাম দমিলেন না। তিনি তাঁহার নিজের বাহুবল ও তাঁহার বন্ধুদের আত্মোৎসর্গের ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া অকূল সাগরে ভাসিলেন। সীতারামের সম্মুখে খাদ্য-দ্রব্যসমস্যাই প্রবল আকারে দেখা দিল। তাঁহার প্রজাবৃন্দের কোন আহার্য্যকষ্ট না হইলেও, কি করিয়া তিনি সৈন্যদের রসদ যোগাইবেন ও যুদ্ধাদির আশঙ্কায় কিরূপে রসদ মজুত রাখিবেন—তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। এই সঙ্কটে তিনি একমাত্র তরবারির উপর নির্ভর করিলেন। তিনি মাঝে মাঝে মোগলদের ও নবাবাশ্রিত জমীদারগণের খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য-পূর্ণ নৌকা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের সময় আক্রমণ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে আশু রসদসমস্যা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইলেন।

মোগলসেনাপতিগণ একযোগে ভূষ্‌ণা ও মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। নবনিযুক্ত ফৌজদার ও সংগ্রামসিংহ একদলের নেতৃত্বভার

লইয়া ভূষ্ণা আক্রমণের জন্য জলপথে যাত্রা করিলেন—অপর-দলকে লইয়া দয়ারাম মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য স্থলপথে রওয়ানা হইল। জলপথগামী সেনাদল ভূষ্ণার নিকটবর্ত্তী হইতেই সীতারাম তাহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কামানের ধূমে মধুমতীর উভয়তীর অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। বাঙ্গালী সৈন্যগণের মুহুর্মুহু রণোল্লাস-ধ্বনি ও মুসলমান সৈন্যের দীন্ দীন্ রবে চারিদিক্ সচকিত হইয়া উঠিল। জলে স্থলে দিনের পর দিন তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

এদিকে দয়ারাম মহম্মদপুরের নিকট উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। মোনাহাতীর বীরত্বখ্যাতি তখন বাংলার নানাপ্রান্তে প্রচারিত; দয়ারাম মহম্মদপুরের সুরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া মোনাহাতীর মত সেনাপতির সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিল না। যেমন করিয়াই হোক্, মোনাহাতীকে না মারিলে মহম্মদপুর হস্তগত করা যাইবে না—এই মনে করিয়া দয়ারাম মোনাহাতীকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিল এবং নগর আক্রমণ না করিয়া নীরবে শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিল।

সেদিন প্রত্যূষে কুয়াশায় চারিদিক্ এমনভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, একহাতের মধ্যেও কোন জিনিস দৃষ্টিগোচর হয় না। মোনাহাতী তাঁহার চিরাভ্যস্ত নিয়ম অনুসারে সেই কুয়াশার মধ্যেই প্রাতভ্রর্মণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার নিয়ম

ছিল—একবার নগর প্রদক্ষিণ না করিয়া তিনি প্রাতভ্র্মণ শেষ করিতেন না। শত্রু অতি নিকটে থাকিলেও, তিনি কোন বিপদের আশঙ্কা না করিয়া, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছিলেন—হঠাৎ দয়ারামের গুপ্তঘাতকের দল পিছন হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলিল। বহু লোক একযোগে, অতর্কিতভাবে শূলবিদ্ধ করায় মোনাহাতী কোন শক্তিপ্রকাশের বিন্দুমাত্র অবসর পাইলেন না। শূলাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া রক্তাক্তদেহে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। নিষ্ঠুর ঘাতকগণ তাহার উপরেও তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। প্রবলবেগে সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল,—নিদারুণ আঘাতে তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল—তবুও তাঁহার প্রাণবায়ু দেহমুক্ত হইল না। তাঁহার হস্তে এক সন্ন্যাসিপ্রদত্ত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ছিল,—সে কবচ দেহলগ্ন থাকিলে কিছুতেই প্রাণ বাহির হইবে না। তিনি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার মৃত্যুসন্ধান বলিয়া দিলেন। ঘাতকগণ কবচ খুলিয়া ফেলিল—তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। নৃশংস ঘাতকগণ তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইয়া দয়ারামের শিবিরে উপস্থিত হইল। দয়ারাম নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য মোনাহাতীর ছিন্নমুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করিল। নবাব, সেই বিশাল ছিন্নমুণ্ডের উপর এক অপার্থিব বীরত্বের বিলীয়মান ছায়া দেখিয়া, হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং সেই মহাবীরকে জীবন্ত বন্দী না করিয়া এরূপভাবে হত্যা করা যে

ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে, তাহাই বলিয়া বার বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নবাব সসম্মানে সেই ছিন্নমুণ্ড মহম্মদপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

মোনাহাতীর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ যখন ভূষণায় সীতারামের নিকট পৌঁছিল, তখন সীতারামের বোধ হইল, যেন শতসহস্র বজ্র একসঙ্গে ভীষণ-গর্জ্জনে তাঁহার মাথায় পড়িয়া তাঁহাকে রসাতলের অতল গহ্বরে সমাহিত করিয়া দিল। তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেলেন। মোনাহাতী ছিলেন সীতারামের কার্য্যের উৎসাহদাতা, বিপদের বন্ধু, জটিলতার মীমাংসক, স্বাধীনতার উদ্দীপক, অবসরের সখা—এক কথায় যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহার অভাবে সীতারামের বোধ হইল, যেন এই সূর্য্যালোকদীপ্ত পৃথিবী তাঁহার চোখের সাম্‌নে একটা বিরাট অন্ধকারের স্তূপে পরিণত হইল;—শুধু অন্ধকার—সাম্‌নে ও পিছনে শুধু অন্ধকারের অতল গহ্বর। এতদিন তিনি মনে-মনে যে সৌধ রচনা করিতেছিলেন, আজ কোথাকার এক ভূমিকম্পে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সীতারাম ভাবিতে লাগিলেন—তিনি এখন কি করিবেন। যদি মোগলের সহিত সন্ধি করেন, তবে হয়ত তাঁহার ধনপ্রাণ রক্ষা পাইতে পারে, হয়ত স্বাধীনতার বিনিময়ে মুক্তিভিক্ষা পাইতে পারেন। এক-দিকে নিশ্চিন্ত আরাম, ধনৈশ্বর্য্য, সুখ-শান্তি, অন্যদিকে সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চিরকালের মত পরিসমাপ্তি—সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার চির-নির্ব্বাণ—নিশ্চিত মৃত্যু। সীতারাম তাঁহার

অনিবার্য্য পরিণামকে বরণ করিয়া লইলেন ; তিনি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া মোগলের পদসেবী হইয়া থাকিবেন না,—তিনি প্রাণ দিবেন—তবুও মান দিবেন না।

মোনাহাতীর অভাবে মহম্মদপুরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে জানিবার জন্য সীতারাম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হয়ত বা এতক্ষণ তাঁহার প্রিয়তম রাজধানী শত্রুকবলিত হইয়াছে। হয়ত বা মোনাহাতীর বিহনে তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ ভীত হইয়া মুসলমানের করে দুর্গ সমর্পণ করিয়াছেন। সীতারাম একবার মহম্মদপুরের অবস্থা দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যাইবেন কি করিয়া, চারিদিকে শত্রু—নদী-তীরে শত্রুর শিবির। তিনি ভূষণার ভার এক বন্ধুর উপর দিয়া, নির্জ্জন নিশীথে, কয়েকজন অনুচরের সহিত ছদ্মবেশে মহম্মদপুরে উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদপুরে উপস্থিত হইয়া সীতারাম দেখিলেন যে, সহকারী সেনানায়কগণ দুর্গ শত্রুকরে সমর্পণ করে নাই বটে—কিন্তু দুর্গের বাহিরে বিজয়োন্মত্ত মুসলমান-সৈন্যগণ লুণ্ঠনে ব্যস্ত আছে এবং অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দ প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। সীতারামের উপস্থিতিতে দুর্গবাসিগণ আশ্বস্ত হইল। সীতারাম ভূষ্ণা-রক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদ-পুর-রক্ষার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভূষ্ণায় যে সমস্ত সৈন্য ও কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল, তাহা রাত্রিতে গোপনে মহম্মদপুরে আনা হইল। সীতারাম

পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, এ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে। তবুও সীতারাম একবার শেষ চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মোনাহাতীর কবন্ধের সৎকার করিলেন এবং কয়েক দিন পরে মুর্শিদাবাদ হইতে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড মহম্মদপুরে আসিলে তাহাও একই স্থানে সৎকার করিলেন। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁহার চিতাভস্মের উপর এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন।

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভূষণায় যে মোগলসেনাদল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তাহাও দয়ারামের সাহায্যার্থে মহম্মদপুরে উপস্থিত হইল। মধুমতীর তীরে সেই জলসৈন্যদলের নৌবহর অবিশ্রান্তধারায় অনলবর্ষণ করিতে লাগিল। নদীতীরে সজ্জিত সীতারামের কামানশ্রেণীও ভীমগর্জ্জনে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। ভীষণ অগ্নিলীলা চলিল। মোগলপক্ষের কামানের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় দীর্ঘ সময় আর যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত রহিল না। সীতারামের গোলন্দাজগণ একে একে রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সীতারামের সমস্ত কামান শত্রুর হস্তগত হইল। ক্রমে দয়ারামের সৈন্যদল দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুর্গের সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সীতারামের সেনাপতিগণ অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কয়েকদিন ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। ক্রমে সীতারামের সেনাপতি-গণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরোচিত শয্যাগ্রহণ করিতে লাগিল। সৈন্যসংখ্যা

হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। সীতারাম যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে, তখন তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে গোপনে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহার ইষ্টদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট শেষ আত্মনিবেদন করিয়া, উন্মুক্ততরবারিহস্তে, দুর্গদ্বার হইতে বাহির হইয়া ক্ষিপ্তের মত শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সাগরতরঙ্গের মত অসংখ্য নবাবসৈন্যের সহিত সীতারাম একাকী কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন! শীঘ্রই তিনি আহত ও ভীষণরণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা-বসানে চোখ মেলিয়া দেখিলেন—তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।

তারপর সীতারামের বড়সাধের রাজধানী মহম্মদপুরে এক বীভৎস তাণ্ডব-লীলার অনুষ্ঠান হইল। বিজয়োন্মত্ত মুসলমান-সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। সন্ত্রস্ত অধিবাসিগণ নগর ছাড়িয়া ভালরূপে পলাইবারও সুযোগ পাইল না,—সৈন্যেরা তাহাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইতে লাগিল। ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল; লেলিহান অগ্নির গর্জ্জনের সহিত তাহাদের বিকট হর্ষধ্বনি মিশ্রিত হইয়া তুমুল কলরবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সোনার মহম্মদপুর ছারখার হইয়া গেল,—নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত হইল। সীতারামের কীর্ত্তি, গঠন-প্রতিভা ও বীরত্বের অতিক্ষীণ নিদর্শন-স্বরূপ, বিধ্বস্ত

মহম্মদপুর, পরবর্ত্তী কালে কৌতূহলী জনমণ্ডলীর নিকট একবিন্দু সাক্ষ্য দিবার জন্য, মরুভূমির মত বিরাট শূন্যতা ও বিপুল ব্যর্থতা বুকে করিয়া চিরদিনের মত পড়িয়া রহিল !

এদিকে সীতারামকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠান হইল। দয়ারামের কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ নবাব তাহাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। রামজীবনের মন্ত্রণার ও রাজভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ সীতারামের অধিকাংশ রাজ্য তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। দয়ারাম সীতারামের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহকে দিঘাপাতিয়া লইয়া গেল। সীতারাম কিছুদিন মুর্শিদাবাদের কারাগারে অবস্থান করিবার পর, যখন শুনিলেন যে, ভীষণ শূলে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হইবে, তখন নিজের হস্তস্থিত বিষাক্ত আংটি চুষিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এই বাঙ্গালী বীরের রাজ্য ও জীবনের উপর শেষ যবনিকাপাত হইল।

মহারাজ মোহনলাল

বাংলার স্বাধীনতা-লক্ষ্মী বাংলা হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্ব্বক্ষণে, বঙ্গ-ইতিহাসের এই বিষাদময়, করুণ অধ্যায়ে যখন বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও হৃদয়হীনতার দূষিত বাষ্পে বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন এই বঙ্গবীর, তাঁহার বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও প্রভুভক্তির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সেই ঘনায়মান অন্ধকারের বক্ষের উপর অস্তগামী সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মির মত একবার ম্লান ও করুণ কিরণসম্পাত করিয়াছিলেন।

মোহনলাল প্রথমে সামান্য একজন লোক ছিলেন। কোন এক শুভমুহূর্ত্তে তিনি সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিচিত হন। ক্রমে মোহনলালের প্রভুভক্তি, কর্ম্মকুশলতা ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সিরাজ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে থাকেন। শেষে সিরাজ বাংলার নবাব হইলে তিনি মোহনলালকে তাঁহার সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একজন সহকারী সেনানায়কের পদে উন্নীত করেন। মোহনলাল সহকারী সেনাপতি হইলে সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে মহারাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়া পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ প্রদান করিলেন। মোহনলালও আজীবন ছায়ার ন্যায় সিরাজের পশ্চাতে থাকিয়া

ও শেষে তাঁহার জন্য প্রাণদান করিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গ মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন, এই সংবাদ সিরাজের কর্ণ-গোচর হইল। শওকতজঙ্গ লিখিলেন,—"দিল্লীর বাদশাহ আমাকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসনের সনন্দ দিয়াছেন। সিরাজ, তুমি এই চিঠি পাওয়া মাত্র মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন কর। আমি দিল্লীর বাদশাহের সনন্দবলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। তুমি আত্মীয়, তোমার প্রাণ বধ করিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু সাবধান, রাজকোষ হইতে যেন এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না কর।"

সিরাজদ্দৌলা এই পত্র পাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। তখন সিরাজের বিরুদ্ধে এক ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে জগৎশেঠ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, যে দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ পাইয়াছে, সে-ই প্রকৃতরূপে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বর। মুহূর্ত্তের মধ্যে সিরাজ যবনিকার অন্তরালে তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য যে নীরব আয়োজন হইতেছিল, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইলেন। তাঁহার সারাদেহে উষ্ণ-রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া জগৎশেঠকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন।

যুবক সিরাজ এই সঙ্কটে মহারাজ মোহনলালের সাহায্য

গ্রহণ করিলেন। প্রভুভক্ত বীর তাঁহার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া শওকতজঙ্গের আসিবার পূর্ব্বেই পূর্ণিয়া আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। সিরাজও নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই বিপদের সময় অন্তর্ব্বিবাদ অত্যন্ত অশোভন মনে করিয়া, মোহনলাল সিরাজকে অনুরোধ করিয়া জগৎশেঠের কারামুক্তির উপায় করিয়া দিলেন। সিরাজের আদেশে জগৎশেঠ কারামুক্ত হইলেন। মীরজাফর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জগৎশেঠ মুক্ত না হইলে তিনি অস্ত্রগ্রহণ করিবেন না,—এখন জগৎশেঠের মুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি একদল সৈন্যের নেতৃত্বভার লইয়া পূর্ণিয়া-অভিযানে অগ্রসর হইলেন। মোহনলালও এক সৈন্যদলের সেনাপতি হইয়া, জলঙ্গী ও পদ্মা পার হইয়া পূর্ণিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

পূর্ণিয়া আক্রমণের সংবাদে শওকতজঙ্গের উদ্দাম বিলাস-স্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল। শওকত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও মিথ্যা-গর্ব্বোদ্ধত ছিলেন। তিনি সুরা ও সঙ্গীতের মোহ ত্যাগ করিয়া একদিনেই সেনাপতি সাজিয়া এক বিরাট সেনাদলের সহিত সিরাজকে বাধা দিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং বহুদূরবিস্তৃত এক জলাভূমির নিকট শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এই জলাভূমি ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। এই জলাভূমির পরপারে মোহনলাল সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে

শওকতজঙ্গ অত্যন্ত অনুকূলস্থানে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন, কারণ বিস্তৃত জলাভূমি পার হইয়া শত্রুর কামান ও অশ্বারোহিগণ সহজেই অগ্রসর হইতে পারিবে না। মোহনলালের কামান-শ্রেণী অজস্র গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু অধিকাংশ গোলাই জলাভূমির মধ্যে পড়িয়া কার্য্যকরী হইতে পারিল না। তবুও যে দুই-একটি গোলা জলাভূমি পার হইয়া শওকতজঙ্গের শিবিরে গিয়া পড়িল—তাহাতেই তাঁহার সৈন্যগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই জলাভূমি পার হইবার একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর, ফল সন্তোষ-জনক নয় দেখিয়া, মোহনলাল সেই স্বল্পপরিসর রাস্তা ধরিয়া প্রবলবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই রাস্তায় ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শওকতজঙ্গের সেনাদলের গোলাবর্ষণে মোহন-লালকে অর্দ্ধপথে ক্ষণেকের জন্য থামিতে হইল। এই সাময়িক জয়ে উল্লাসিত হইয়া শওকতজঙ্গ, সেনাপতিগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও অশ্বারোহী সৈন্যগণকে সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিলাসলীলায় মগ্ন হইলেন। এদিকে অশ্বারোহী সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া নিবিড় পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। মোহনলাল সেই সুযোগে ভীমবেগে অগ্রসর হইয়া শওকতজঙ্গের কতকগুলি কামান হস্তগত করিয়া ফেলিলেন —অন্যান্য সৈন্যগণ প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই সংবাদ যখন শওকতের শিবিরে যাইয়া পৌঁছিল, তখন নর্ত্তকীগণের নূপুরনিক্কণে তাঁহার শিবির মুখরিত। তিনি মদিরাঢুলু ঢুলুনেত্রে,

সঙ্গীতের তালে তালে, অস্পষ্ট ভাষায়, উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি সেই অবস্থায়ই যুদ্ধে উপস্থিত হইবার জন্য বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহার স্খলিতপদ ও অবশ শরীর লইয়া কিছুতেই একপাও হাঁটিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া আবার যুদ্ধে অগ্রসর হইল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর, হঠাৎ এক বন্দুকের গুলি শওকতজঙ্গের ললাটে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। মোহনলাল যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা মোহনলালের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পূর্ণিয়ার শাসনভার অর্পণ করিলেন।

বাংলার ভাগ্যনিয়ামক যুগান্তকারী সেই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলাল যে অমানুষিক বীরত্ব, অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অলৌকিক প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন—বাঙ্গালী তাহা কোন দিন ভুলিতে পারিবে না। সে অপার্থিব কাহিনী, গৌরব-কিরীটের মত জাতির মস্তকে চিরকাল অম্লান জ্যোতিতে শোভা পাইবে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন। আকাশ মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বিষাদমৌন। মাঝে মাঝে অশ্রুধারার মত বারিপাত হইতেছে। দিনের আলো দিগন্তে মিলাইয়া যাইবার পরক্ষণেই ইংরাজবাহিনী, ভাগীরথী পার হইয়া পলাশীর দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিল। ইংরাজসেনাপতি পলাশীর বিস্তৃত আম্রকানন সেনাসন্নিবেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনা করিয়া, পাছে নবাব-সৈন্যগণ অগ্রেই এই অনুকূলস্থান দখল করে, এই ভয়ে দ্রুত-বেগে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। সেই আম্রকানন অসংখ্য আম্রবৃক্ষে পূর্ণ থাকায় 'লক্ষ বাগ' নামে পরিচিত ছিল। ক্লাইভ সমস্ত দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া গভীর রাত্রিতে সেই আম্রকাননে উপস্থিত হইলেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা তেজনগরের এক অংশে এক বিস্তৃত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। সেই দুর্য্যোগময়ী নিশীথিনীর গভীর অন্ধকার আলোড়িত করিয়া, সিরাজের শিবির হইতে উচ্চ রণবাদ্য উত্থিত হইল। ভাগীরথীর তরঙ্গ-শব্দের সহিত সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া জল-স্থল কম্পিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কি এক অজানিত দুশ্চিন্তায় সিরাজের মন ক্রমেই পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন এক ভাবী অমঙ্গলের কালো যবনিকা তাঁহার আলোকোজ্জ্বল শিবিরের সমস্ত শোভা ঢাকিয়া দিয়া তাহাকে নিষ্প্রভ ও শ্রীহীন করিয়াছে। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতার চাপা কণ্ঠস্বর যেন বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইয়া একটা অজানিত বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে! সেই রহস্যময়ী রাত্রির প্রহরগুলি একের পর একে চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সিরাজের বিন্দুমাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি একাকী তাঁহার কক্ষে বসিয়া রহিলেন। স্বর্ণ-নির্ম্মিত আলবোলায় সুগন্ধি

তামাক পুড়িয়া পুড়িয়া কক্ষ আমোদিত করিতেছিল,—গভীর চিন্তামগ্ন সিরাজ এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই; হঠাৎ ধূমপানের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখিলেন—আলবোলা গৃহমধ্যে কোথাও নাই। বাংলার নবাব, এই আকস্মিক চৌর্য্যের কোন অনুসন্ধান বা প্রতিবিধান করিতে উদ্যত হইলেন না—নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার ভাগ্যের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্লাইভেরও সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রহরে প্রহরে নবাব-শিবিরের রণবাদ্যধ্বনিতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আগামী কল্যের যুদ্ধের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে; তাঁহার আশার পরিণাম, তাঁহার এতদিনের সাধনার ফল, তাঁহাদের বাংলায় অবস্থিতির স্থায়িত্ব আগামী কল্যই নির্দ্ধারিত হইবে। একবার তিনি আশার স্বপ্নে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন—আর একবার আশঙ্কা ও নিরাশায় তাঁহার হস্তপদ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ক্লাইভ শিবিরকক্ষে পদচারণা করিয়া কাটাইলেন।

কাল রাত্রি প্রভাত হইল। ক্লাইভ অতি প্রত্যূষেই আম্রকাননের উত্তরে তাঁহার সৈন্যের ব্যূহ রচনা করিয়া নবাব-সৈন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সিরাজও প্রভাতেই মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ, মোহনলাল, মীরমদন, ফরাসী-সেনাপতি সিনফ্রে প্রভৃতিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া আম্রকাননের

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নবাববাহিনীর এক পার্শ্বে রহিলেন ফরাসীবীর সিন্‌ফ্রে, অপর পার্শ্বে মহারাজ মোহনলাল, মধ্যস্থলে সেনাপতি মীরমদন। ক্লাইভ ব্যূহের অভেদ্য আকৃতি দেখিয়া ভাবিলেন যে, যদি এই অবস্থায় নবাববাহিনী গোলাবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তবে ইংরাজসৈন্যগণকে দাবদাহে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে হইবে। ক্লাইভের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন।

মীরমদন যখন কামানে প্রথম অগ্নিসংযোগ করিলেন—তখন বেলা ৮টা। ভীমগর্জ্জনে ভাগীরথীর উভয়কূল প্রতিধ্বনিত করিয়া মীরমদনের কামানশ্রেণী অনলবর্ষণ করিতে লাগিল। আধঘণ্টা এইভাবে যুদ্ধ চলিবার পর দেখা গেল যে, ইংরাজপক্ষের ৩০ জন সৈন্য ধরাশায়ী হইয়াছে, কিন্তু নবাবপক্ষের একটি সৈন্য আহতও হয় নাই। এই ভাবে যুদ্ধ চলিলে সামান্য ইংরাজসৈন্য আর কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে! ক্লাইভের অধরোষ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। তিনি পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়া কয়েকটি তোপ বাহিরে রাখিয়া, আর অন্যগুলি উঠাইয়া লইয়া সসৈন্যে আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক উমীচাঁদ তখন ইংরাজশিবিরে অবস্থান করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া ক্লাইভ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, তোমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কী ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি! তোমরা আমার সর্ব্বনাশ করিলে! তোমরা

বলিয়াছিলে যে, সামান্য একটু যুদ্ধের অভিনয় করিবে মাত্র, এখন দেখিতেছি, যেভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে কয়েক-ঘণ্টার মধ্যে আমাদের একটি সৈন্যও জীবিত থাকিবে না।” উমীচাঁদ ক্লাইভকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল যে, যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা মীরমদন ও মোহনলালের সৈন্য এবং মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি তাঁহাদের কথা রাখিয়াছেন।

মীরমদন ও মোহনলাল ক্রমে ক্রমে আম্রকাননাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরমদনের কামানের ধূমে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। মীরমদন ও মোহনলালের সৈন্যগণ মার্ মার্ শব্দে ইংরাজসৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি যুদ্ধ না করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময় যদি মীরজাফর প্রভৃতি মীরমদন ও মোহনলালের সহিত ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিতেন, তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ইংরাজসৈন্যসহ আম্রকানন ভস্মীভূত হইয়া যাইত এবং বাংলার ইতিহাস আজ অন্যভাবে লিখিত হইত।

দ্বিপ্রহর-কালে আষাঢ়ের আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। মীরমদনের বারুদবাহী গাড়ীর উপর উপযুক্ত আচ্ছাদন না থাকায় সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ক্ষিপ্রগতিতে মীরমদন তাহার যথাসাধ্য প্রতীকার করিয়া পুনরায় ভীষণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর

অকস্মাৎ এক গোলার আঘাতে মীরমদনের দক্ষিণ উরু ভগ্ন হইয়া গেল। মীরমদনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে দেখিয়া মোহনলাল তৎক্ষণাৎ মীরমদনের স্থান পূর্ণ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আহত মীরমদনকে সকলে বহন করিয়া সিরাজদ্দৌলার শিবিরে লইয়া গেল। বিশ্বাসী বীর চিরদিনের মত চোখ বুজিবার পূর্ব্বে জড়িতস্বরে সিরাজদ্দৌলাকে বলিলেন, "প্রধানসেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ করিতেছেন না। চারিদিকে ঘোরতর ষড়যন্ত্র—সাবধান হইবেন।"

সিরাজদ্দৌলা পূর্ব্ব হইতেই ভীষণ ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যের সম্মুখে যে মীরজাফর এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন, তাহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ছিল। সিরাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। অসহায় যুবক আকুল হইয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর, পুত্র মীরন ও কয়েকজন অনুচরের সহিত অতি সন্তর্পণে সিরাজ-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সিরাজদ্দৌলা রাজমুকুট মীরজাফরের পদতলে রাখিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "এই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজমুকুট তোমার পায়ের নিকট রাখিলাম, তুমি ভিন্ন আজ ইহাকে রক্ষা করে এমন লোক আর আমার কেহ নাই। তোমার প্রতি যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি, তবে তাহা ক্ষমা কর,—আজ আলিবর্দ্দীর পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার ধন-প্রাণ ও মান রক্ষা কর

চতুর মীরজাফর কপট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"এ ত সামান্য কথা! ইহার জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই। আজ সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—আজ আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, আগামীকল্য প্রাতে আবার পূর্ণবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করা যাইবে; তুমি সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দাও।" সরল যুবক মীরজাফরের স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সৈন্যগণকে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। মোহনলাল তখন ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধক্ষান্তির আদেশ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "আর অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের শেষ হইবে—এখন একপাও পশ্চাতে হটিয়া গেলে বিপরীত ফল ফলিবে। এখন যুদ্ধ বন্ধ করা অসম্ভব, আমি শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ করিয়া আসিতেছি।" মোহনলালের আপত্তিতে মীরজাফর বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তাঁহার সমস্ত কৌশল বুঝি ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বার বার সিরাজদ্দৌলাকে বুঝাইতে লাগিলেন; অবশেষে পুনর্ব্বার মোহনলালকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সিরাজের আদেশ উল্লেখ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল বিষম বিপদে পড়িলেন। তিনি সহকারী সেনাপতি; যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান-সেনাপতির ও নবাবের আদেশ অমান্য করা সামরিক নিয়মের বিরুদ্ধ ও দণ্ডার্হ। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেনাপতির

আদেশ পালন করিলেন। নিশ্চিত জয়ের গৌরব হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধে, দুঃখে ও ক্ষোভে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। নখর-বিদ্ধ শিকার পলায়ন করিলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন নিষ্ফল গর্জ্জনে চারিদিক্ সচকিত করে, মোহনলালও সেইরূপ নিষ্ফল ক্রোধ ও আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে উন্মত্তবৎ শিবির-অভিমুখে ফিরিলেন। মোহনলালকে পশ্চাতে হটিতে দেখিয়া ইংরাজসৈন্যগণ আম্রবন হইতে বহির্গত হইয়া জয়ধ্বনির সহিত প্রবলবেগে নবাবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ মীরজাফরের সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি রণে ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মোহনলাল সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। ভীষণ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া অঙ্কলব্ধ বিজয়লক্ষ্মীকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন—বাংলার সিংহাসন তিনি বিশ্বাসঘাতকের প্ররোচনায় শত্রুর করে অর্পণ করিয়াছেন! অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, ক্রোধে ও দুঃখে জ্বলিতে জ্বলিতে, তাঁহার নির্ম্মম ভুল সংশোধনের জন্য তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তখন নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ; যে যাহার মত যেদিকে সুবিধা পাইতেছে পলাইতেছে, নবাবের পরাজয় রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে—বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণও ইংরাজসৈন্যের অবিরলধারায় গুলি-বর্ষণে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তবুও মোহনলাল

একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে একত্র করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সেনাপতিগণের পলায়নে নবাবসৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। মোহনলাল জ্বালাময়ীবাণীতে তাহাদের শিথিল ধমনীতে শক্তি-সংযোগ করিয়া সেই অবশিষ্ট সৈন্য সহ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, ক্ষতস্থান দিয়া প্রবলবেগে রক্ত পড়িতে লাগিল,তবুও মোহনলাল রুধিরস্নাতদেহে বাংলার সিংহাসন রক্ষার জন্য ভীমবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয়, নিরাশামথিত সৈন্য-গণকে লইয়া মোহনলাল আর বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না; শীঘ্রই গুরুতরভাবে আহত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সিরাজের সন্ধানে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইভের রণবাদ্য পলাশীপ্রান্তর ও ভাগীরথী-বক্ষ কাঁপাইয়া দিকে দিকে তাঁহার জয় ঘোষণা করিল।

এদিকে যখন সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন, এক মোহনলাল ব্যতীত সকলেই একটু যুদ্ধের অভিনয় মাত্র করিয়া পলায়ন করিতেছে, চারিদিকে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জাল সুকৌশলে পাতা হইয়াছে, পলাশীপ্রান্তরে আর তাঁহার জয়ের কোন আশাই নাই—তখন রাজধানী রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া তিনি গজারোহণে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের চেষ্টায় পূর্ব্বেই সিরাজের পরাজয়বার্ত্তা

মুর্শিদাবাদে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। নগরবাসীরা যে যাহার মত ধন-প্রাণ লইয়া চারিদিকে পলাইতেছিল। তিনি সৈন্যসংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল—কেহই তাঁহার কথা শুনিল না; তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। চারিদিকে তাকাইয়া আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি ক্ষিপ্তের মত ধনাগারে গমন করিলেন ও সশব্দে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকলকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থের বিনিময়েও কেহ তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিল না। তিনি সমস্ত নগরবাসী, আত্মীয়, অনাত্মীয়, শত্রু, মিত্র—সকলের পায়ে ধরিয়া, সজল-চোখে ও কাতরকণ্ঠে তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে বার বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল না। দুইদিন পূর্ব্বে একবিন্দু কৃপাকটাক্ষের জন্য লালায়িত হইয়া যে-সমস্ত লোক তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া ধন্য হইত—আজ তাহারাই উপেক্ষার হাসি হাসিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল। সেদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কলকোলাহল-পূর্ণ রাজধানী শ্মশানের নির্জ্জনতা বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নগরের আলোকশ্রেণী আর জ্বলিল না, সুসজ্জিত নাগরিকগণের আনন্দোচ্ছল কলহাসিতে রাজপথ আর মুখরিত হইল না। সিরাজের প্রিয়তম রাজপ্রাসাদ হীরাঝিলের কক্ষগুলি নিবিড় অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া গুমরিয়া মরিতে লাগিল। সেখানে মণিমাণিক্যখচিত আলোকাধারে বিচিত্র বর্ণের আলো আর

জ্বলিল না, নর্ত্তকীর লীলায়িত পদবিন্যাসে নৃত্যশালার মর্ম্মরবুকে অপূর্ব্বছন্দের শিহরণ আর জাগিল না—সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শ্রোতার মনে এক অপার্থিব সুরলোক রচিত হইল না—ইন্দ্রপুরী-তুল্য বিশাল প্রাসাদ এক মর্ম্মান্তিক শূন্যতায় যেন হায় হায় করিতে লাগিল।

এই শত্রুপুরীতে তাঁহার জীবন আর তিলমাত্র নিরাপদ নহে মনে করিয়া, সিয়াজ মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। আলিবর্দ্দীর স্নেহের দুলাল, আজীবন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, অসূর্য্যম্পশ্যা পুষ্পপেলবা পত্নী লুৎফুন্নিসার সহিত সামান্য পরিচ্ছদে, রাত্রির গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, তাঁহার বড় সাধের রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

ওদিকে মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, সিরাজ মুর্শিদাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদে আসিয়া সিরাজের পলায়ন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সিরাজের জয়পতাকা রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রভুভক্ত বীর নিদারুণ নিরাশায় মর্ম্মাহত হইলেন। তখন সিরাজের জীবনরক্ষার জন্য মোহনলাল ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভগবানগোলার পথে সিরাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু তিনি বেশীদূর

অগ্রসর হইতে পারিলেন না, মীরজাফরের গুপ্তচরগণ তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। মোহনলালকে রায়দুর্লভের তত্ত্বাবধানে কারাগারে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হইল। মোহনলাল জীবিত থাকিলে ষড়যন্ত্রকারীদের কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন হইতে পারে মনে করিয়া, মীরজাফরের আদেশে রায়দুর্লভ তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। তাঁহার ধনসম্পত্তি নবাবসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইল। প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের জীবনলীলার অবসান হইল।

কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে, বিশ্বাস বংশে, সুরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস,—তিনি কলিকাতায় সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন। জন্মগ্রহণ করিবার পর কিছুদিন সুরেশ পল্লীমায়ের স্নিগ্ধ ক্রোড়েই লালিত হন।

এক ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—শিশুই মানুষের পিতা। এ বাক্যের সত্যতা সুরেশচন্দ্রের জীবন দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। ভবিষ্যতে যে সুরেশচন্দ্র একজন অসমসাহসিক বীর হইবেন, তাহা তাঁহার শৈশবের কার্য্যাবলী হইতেই বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

সুরেশচন্দ্র যখন দুই বছরের, তখন একদিন একাকী খেলা করিতে করিতে হঠাৎ প্রাচীরসংলগ্ন এক মই দেখিতে পান। ঐ মইখানি মাটি হইতে প্রায় ২০ ফুট্ উঁচু ছিল। শিশু সেই মই বাহিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। মাতা তাহা দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া আসিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শিশু মাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আরও উপরে উঠিতে লাগিল। যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া মাতা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার চীৎকারে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হইল। কি করিয়া শিশুকে

নামান যায়, তাহাই তাঁহারা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সুরেশ সকলকে দেখিয়া কেবলই করতালি দিতে দিতে হাসিতে লাগিলেন। শেষে কয়েকজন দৃঢ়পদে মই চাপিয়া ধরিলেন এবং একজন শিশুকে নামাইয়া লইয়া আসিলেন।

সুরেশচন্দ্র যখন প্রায় পাঁচ বৎসরের তখন একটা ঘটনায় তাঁহার অলৌকিক দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিন দেখিলেন যে, একটি বিড়াল নিকটস্থ একটি বেলগাছ হইতে একটি কাঠবিড়ালী ধরিয়া লইয়া আসিল। মাটিতে নামিয়া বিড়াল কাঠবিড়ালীর রক্তাক্ত দেহের উপর বসিয়া তাহার ক্ষীণ জীবনধারাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুরেশচন্দ্র কাঠবিড়ালীকে তখনও জীবিত দেখিয়া, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বিড়াল শিকার হাতছাড়া হয় দেখিয়া সুরেশকে আক্রমণ করিল। ভীষণ নখরাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল—দরদরধারায় রক্ত পড়িয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত হইয়া গেল। সুরেশ যন্ত্রণা-সূচক একটি শব্দও করিলেন না—কেবল প্রাণপণে বিড়ালকে বাধা দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে একজন হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সুরেশকে বিড়ালের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। বিড়ালের এই দন্ত-নখরাঘাতে সুরেশ তিনমাস শয্যাগত ছিলেন।

সুরেশচন্দ্র শৈশবে বীরকাহিনী শুনিতে ভালবাসিতেন। বীরদিগের জীবনী শুনিবার জন্য বালকের হৃদয়ে এক অদম্য

কৌতূহল হইত। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও বিদেশের বীরদের কাহিনী শুনিতে অসীম আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। দল বাঁধিয়া অপরের বাগান হইতে ফলচুরি, গাছ হইতে পাখীর ছানা পাড়া এবং মাছধরা প্রভৃতি কার্য্যে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তিনি তাঁহার পিতার সহিত প্রথম কলিকাতা আসিলেন। গিরীশবাবু ভবানীপুরে কড়েয়ায় একখানি বাড়ী কিনিয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সুরেশকে 'লণ্ডন মিশন' স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময় একবার স্কুলের বন্ধে সুরেশ বাড়ী আসেন। সহরের কৃত্রিমতার ও হৃদয়হীনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া অসিয়া, পল্লী-প্রকৃতির নগ্নলীলার মধ্যে পড়িয়া, বালকের আদিম স্বভাব আবার জাগরিত হইয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্র দিনরাত গাছে গাছে পাখীর ছানার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। একদিন এক আমগাছে পাখীর ছানা পাড়িতে উঠিলে, এক বিষধর সর্প তরুকোটর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বালক সর্পদংশন হইতে নিস্তার পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, সর্পের বিস্তৃত ফণা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন। সাপ লেজদ্বারা তাঁহার দক্ষিণ হাত জড়াইয়া ফেলিল। নির্ভীক সুরেশ তাড়াতাড়ি বামহাত দ্বারা পকেট হইতে একখানা ছুরি বাহির করিয়া সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে একদিন মাছ ধরিয়া ছিপ স্কন্ধে করিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে ফিরিবার সময় সুরেশ দেখিলেন যে, কয়েকজন নীলকর সাহেব বন্দুক ও একদল কুকুর লইয়া বন্যশূকর শিকারে বাহির হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে একটি শূকর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহার পশ্চাতে সাহেব ও কুকুরের দল ছুটিতেছে। সাহেবেরা সুরেশকে চীৎকার করিয়া পলায়ন করিতে বলিলেন; কিন্তু কৌতূহলী সুরেশ পলাইলেন না। সুরেশ স্কন্ধ হইতে ছিপ নামাইয়া শূকরকে এমন ভীষণ প্রহার করিলেন যে, শূকর গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কুকুরের দল আসিয়া শূকরকে আক্রমণ করিয়া ধরিল। তাহার পর সাহেবেরা আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

এই শূকরশিকারের পর হইতে নীলকর সাহেব ও মেমদের নিকট সুরেশ বিশেষ পরিচিত হইলেন। তাঁহারা সুরেশকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। এই সময় এক মেমের অনুরোধে, সুরেশ, এক পুকুরের ভীষণ পাঁকের মধ্যে নামিয়া, নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া, তাঁহাকে পদ্মফুল আনিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পর সুরেশ আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

সুরেশ 'লণ্ডন মিশন' স্কুলে পড়িবার সময় দুর্দ্দান্ত ছেলেদের দলপতি ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁহার কোনরূপ আসক্তি ছিল না। পিতা গিরীশচন্দ্র পুত্রকে যথেষ্ট শাসন করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময় সুরেশ খৃষ্টান বালকদের

সহিত অত্যন্ত' মেলামেশা আরম্ভ করিলেন, এমন কি একত্র আহারাদি পর্য্যন্ত আরম্ভ করিলেন। পিতার অত্যধিক শাসনে, বাড়ীর সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, সুরেশ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। 'লণ্ডন মিশন' স্কুলের প্রিন্সিপাল অ্যাণ্টন্ সাহেব সুরেশকে খুব ভালবাসিতেন। সুরেশের নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়া তিনি স্কুলের বোর্ডিং-এ তাঁহার আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সুরেশ পিতার ত্যাজ্যপুত্র হইয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সে সংসারসমুদ্রে ভাসিলেন।

কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকা সুরেশের প্রকৃতি নয়। তিনি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে মনস্থ করিলেন। তিনি চাকুরীর চেষ্টা আরম্ভ করিলেন; গভর্ণমেণ্ট অফিস, সওদাগরী অফিস, রেল অফিস, পোষ্ট অফিস, ডক প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা—সে সমস্ত স্থানে দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু জুটিল না; তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প, লেখাপড়াও ভালরূপ জানেন না—কে তাঁহাকে চাকুরী দিবে? অবশেষে বহুদিন ধরিয়া ঘুরাঘুরির পর স্পেন্সেস্ হোটেলে একটি সামান্য চাকুরী পাইলেন। যে সমস্ত সাহেব-মেম বিভিন্ন দেশ হইতে কলিকাতায় আসিত, সুরেশ তাহাদিগকে রেলষ্টেশন ও জাহাজঘাট হইতে হোটেলে লইয়া আসিতেন। এই সময় তাঁহার বিলাত যাইবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়। তিনি কি উপায়ে বিলাত যাইবেন, তাহারই সন্ধানে ফিরিতে থাকেন। তিনি সাহেব-মেমদের

নিকট বিলাতের নানাবিধ গল্প শুনিতেন ও তাঁহার ইচ্ছা আরও বাড়িতে থাকিত।

তিনি স্পেন্সেস্ হোটেলের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া, ভাল চাকুরীর আশায় রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন। রেঙ্গুনে যাইয়া নানাস্থানে ঘুরিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। সেখানে তিনি এক মগ ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান। সেখানে তিনি এক প্রজ্বলিত গৃহ হইতে এক রমণীকে উদ্ধার করিয়া মগদের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। রেঙ্গুনে চাকুরীর কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি মাদ্রাজে যাত্রা করিলেন; মাদ্রাজে যাইয়াও কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি বিলাত যাইবার পন্থা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রায়ই তিনি গঙ্গার ধারে জেটিতে জেটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নবাগত জাহাজের কর্ম্মচারীদিগের সহিত আলাপ করিতেন। একদিন বি, এস, এন, কোম্পানীর এক জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। এই জাহাজখানি কেবল কলিকাতায় আসিয়াছে —আবার কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডে রওয়ানা হইবে। সুরেশ এই ক্যাপ্‌টেনের কাছে তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইবার জন্য, বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন। দয়ালু ক্যাপ্‌টেন সুরেশের কথাবার্ত্তা, হাবভাব ও তাঁহার জীবনের ঘটনা শুনিয়া তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্যাপ্‌টেন সুরেশকে

এসিষ্ট্যাণ্ট্ ষ্টুয়ার্ডের পদে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে জাহাজে উঠাইয়া বিলাত লইয়া চলিলেন। সতের বৎসর বয়সে সুরেশ জন্মভূমির নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইলেন।

লণ্ডনে যাইয়া সুরেশ একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। এতবড় প্রকাণ্ড সহর, এত লোকজন, তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। কয়েকদিন জাহাজ হইতে নামিয়া যাইয়া সুরেশ সহর দেখিয়া আবার জাহাজে ফিরিয়া আসিতেন; শেষে জাহাজ লণ্ডন ত্যাগ করিলে, লণ্ডন সহরের 'ইষ্টএণ্ড' নামক এক পল্লীতে সামান্যভাড়ায় ছোট একটা ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

প্রথম লণ্ডনজীবন তাঁহার বড়ই দুঃখের মধ্যদিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মত একজন অল্পবয়স্ক ভারতবাসীকে কে চাকুরী দিবে? তিনি নানারূপ চেষ্টা করিয়া কোথাও চাকুরী না পাইয়া পথে পথে খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে তাহাতেও খাওয়া-পরা চলে না দেখিয়া রাস্তায় মুটেগিরি আরম্ভ করিলেন। মুটেগিরিতে তাঁহার একটু স্বচ্ছলভাবে চলিতে লাগিল এবং সামান্য কিছু অর্থও সঞ্চিত হইল। এই অর্থ দিয়া তিনি কিছু পুরাতন জিনিস কিনিয়া লইয়া বিক্রয় করিবার জন্য ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবাসী বলিয়া ভারতীয় দ্রব্যগুলি পল্লীগ্রামবাসীরা তাঁহার নিকট হইতে অধিকমূল্যে ক্রয় করিতে লাগিল। তিনি একবার মাল ফুরাইয়া গেলে, আবার লণ্ডন



কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

হইতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কয়েকবৎসর ধরিয়া এইভাবে পুরাতনদ্রব্য বিক্রয় করিয়া সুরেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেন, ইংলণ্ডের বহু পল্লী ভ্রমণ করিলেন এবং বহু লোকের সংস্রবে তাঁহার আচার-ব্যবহার ও শিক্ষারও অনেক উন্নতি হইল।

এইরূপে, ফিরিওয়ালার কার্য্যে ঘুরিতে ঘুরিতে, সুরেশ কেণ্ট্ প্রদেশের একটি ছোট সহরে উপস্থিত হইলেন। এখানে এক সার্কাসের দলের ম্যানেজারের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। সুরেশ সার্কাস্-দলে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ম্যানেজার তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া, সপ্তাহে ১৫ শিলিং হিসাবে পারিশ্রমিক ঠিক করিয়া, তাঁহাকে ঐ দলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এই সার্কাস্-দলে প্রবেশ করার পর হইতেই তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তিনি একজন বিখ্যাত সার্কাস্-খেলোয়ার ভাবে সর্ব্বত্র পরিচিত হন।

কিছুদিন সার্কাস্-দলে থাকিবার পর, একবার বিখ্যাত পশুবশকারী প্রফেসার জাম্‌বাকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সুরেশের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রীত হইয়া তিনি সুরেশকে নিজের সহকারীভাবে পশুবশকার্য্য শিক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুরেশ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মত হইয়া জাম্‌বাকের পশুশালায় পশুবশশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুই বৎসর কাল তিনি জাম্‌বাকের নিকট থাকিয়া, হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির সহিত ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া, পুনরায় সার্কাস্-দলে প্রবেশ করিলেন। বিখ্যাত পশুবশকারী বলিয়া তাঁহার নাম

সমস্ত ইউরোপে প্রশংসিত হইতে লাগিল। ব্যাঘ্র ও সিংহের সহিত তাঁহার খেলা দেখিয়া সহস্র সহস্র দর্শক স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে লাগিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, লণ্ডনের মহাপ্রদর্শনীতে তিনি সিংহ ও ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিয়া বহু মেডেল ও পুরস্কার পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ওয়েল্‌স সাহেবের হিংস্রপশু-প্রদর্শনীদলে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুরেশ আমেরিকায় গমন করিলেন। এই দেশে আসিয়া তিনি প্রথমে মেক্‌সিকো, পরে দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রেজিলের রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদ খালি হওয়ায়, সুরেশ এই পদের জন্য প্রার্থী হইলেন। সুরেশের ন্যায় বিখ্যাত পশুবশকারীকে পাইয়া রাজকর্ম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। সুরেশ সার্কাস্‌-দলের কার্য্য ত্যাগ করিয়া পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ হইলেন।

এই কার্য্য করিতে করিতে, তিনি সামরিক বিভাগই বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া, ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদলে সাধারণ সৈনিকভাবে প্রবেশ করিলেন। শীঘ্রই তিনি কার্য্য-দক্ষতাগুণে কর্পোরালপদে উন্নীত হইলেন। ক্রমে সুরেশ এক পদাতিক সৈন্যদলের প্রথম সারজেণ্টের পদলাভ করিলেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদে উন্নীত হইলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ব্রেজিলপ্রদেশে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমস্ত নৌসেনানী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রণপোতসমূহে বিদ্রোহ-পতাকা উড়িতে লাগিল। বহুসংখ্যক রণতরী আসিয়া রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রেজিলের সাধারণতন্ত্রের সৈনিকগণ বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েকদিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নগর আক্রমণ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, বিদ্রোহিগণ রাজধানীর নিকটস্থ নিথেরয় নামক ক্ষুদ্র এক সহর অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইল এবং উহার উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। এই নগররক্ষী সেনাদলের মধ্যে সুরেশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। শত্রুর ঘোরতর আক্রমণে যখন ঐ নগর রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন প্রধান সেনাপতি অধীনস্থ সেনানায়ক-গণকে ডাকিয়া বলিলেন, "নগর রক্ষার আশা আর নাই, তবে একবার শেষ চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে কোন্ সেনাপতি মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে পারে? যদি কেহ এমন সাহসী থাক, তবে অগ্রসর হও।" ক্ষণকাল চারিদিকে গভীর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল—সকলেই অধোমুখে চিন্তায় মগ্ন। ক্ষীণ চন্দ্র বহুক্ষণ হইল অস্তমিত হইয়াছে; ঘোর অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন। অবশেষে সুরেশচন্দ্র উঠিয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি।" সকলেই গভীর বিস্ময়ের সহিত

তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুরেশচন্দ্র সেই তামসী রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ৫০ জন মাত্র সৈন্য লইয়া ভীমবিক্রমে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুগণ ভয়ঙ্করভাবে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তুমুল যুদ্ধ চলিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সুরেশচন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি ভীমগর্জ্জনে সৈন্যদিগকে বলিলেন, "ব্রেজিলের সন্তানগণ কখনও প্রাণ-ভয়ে ভীত নয়; এই দেখ কেমন করিয়া বঙ্গভূমির এক সন্তান শত্রুর কামান কাড়িয়া লয়! আমার অনুসরণ কর।" সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। সুরেশচন্দ্র ক্ষিপ্ত সিংহের মত শত্রুর উপর লাফাইয়া পড়িয়া ভীমবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। শত্রুর অনেক কামান সুরেশ অধিকার করিয়া লইলেন; অনেক গোলন্দাজ তাঁহার হাতে বন্দী হইল। সেই ভীষণ যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন। তাঁহার বীরত্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইল।

সুরেশচন্দ্র ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কর্ণেলপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সুরেশ ব্রেজিলের এক বিখ্যাত ডাক্তারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।